জীবনপাত্র

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

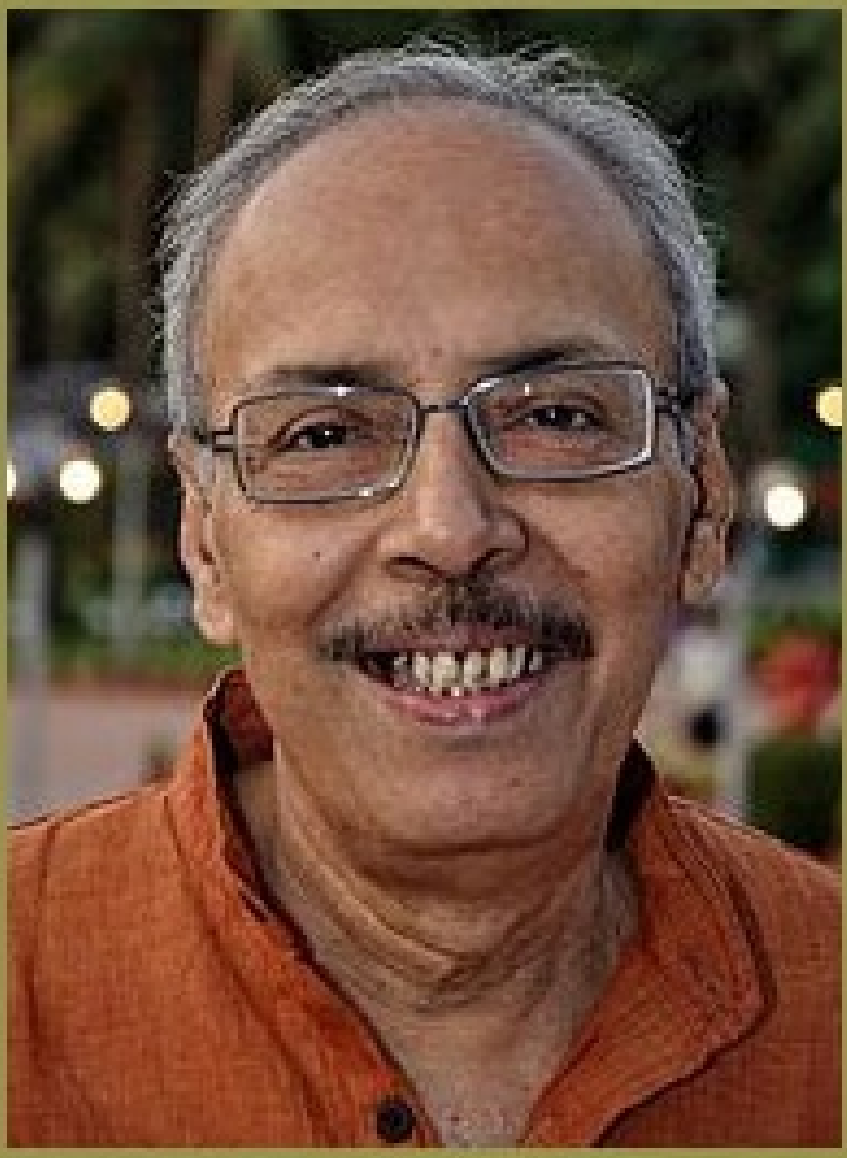

জীবনপাত্র

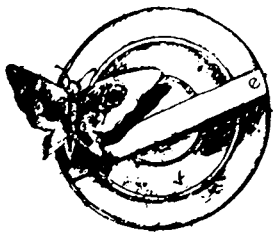

প্রভাসরঞ্জন

নরেনবাবু লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকটা জ্যোতিষবিদ্যা জানুক, আর না-ই জানুক তার মধ্যে বেশ একটা নিরীহ ভাব আছে। আর খুব একটা ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

আমার কোষ্ঠীর ছকটা গত পনেরো বছর ধরে আমার মুখস্থ আছে। কেউ জ্যোতিষ জানে শুনলেই সট সট করে কাগজে ছকটা এঁকে সামনে এগিয়ে দিই। বহুলোক আমাকে বহু রকম কথা বলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সময়ে আমি আশার আলো দেখেছি, কখনও-বা-নিভে গেছি। দীর্ঘদিন পর আবার জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে আমি সামান্য কিছু উত্তেজনা বোধ করেছিলাম।

নরেনবাবু একটু আগে অফিস থেকে ফিরেছেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আজকাল। বাইরে এখন মেঘের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরে গুমোট। বাতাস থম ধরা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-এর ভিতরদিকে গলির ধাঁধার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো-বাতাসহীন ঘর। জানালা-দরজা সবই আছে, তবু আলো বা বাতাস কিছুই আসে না। একটা হলদে বালবের আলো বোধহয় সারাদিনই জ্বলে। বহু আদ্যিকালের একটা পাখা ঘুরছে ওপরে। তার বিষণ্ণ শব্দ হচ্ছে ঘটাং ঘটাং। দেয়ালে পোঁতা গজালের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কাঠের তক্তায় বিস্তর পুরনো পঞ্জিকা জমা হয়ে আছে, বেশ কিছু সংস্কৃত আর বাংলা জ্যোতিষের বই, কয়েকখানা ইংরেজি বইও। পুরনো একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে অসম্পূর্ণ একটা কোষ্ঠীপত্র পড়ে আছে, দোয়াতদান, কলম, ডটপেন, লাল, নীল আর কালো কালির দোয়াত, চশমার খাপ, কোষ্ঠীর তুলোট কাগজ, নোট বই, চিঠি গেঁথে রাখবার কাঠের তলাওলা শিক, তাতে বিস্তর পুরনো চিঠি। এ সবের মধ্যে নরেনবাবু বেশ মানানসই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোলগাল খুব একটা হাসেন না, তবে মুখে একটু স্মিতভাব। আমার কোষ্ঠীর ছক আঁকা কাগজটা দেখছিলেন বাইফোকাল চশমা দিয়ে। মাথাটা নিচু, টাকের ওপর কয়েকটা চুল পাখার হাওয়ায় ঢেউ দিচ্ছে।

একটা বছর আট-নয়েকের ছেলে বুঝি টেবিল থেকে নরেনবাবুর অজান্তে একটা ডটপেন নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ফেরত দিতে এসে সুট করে টেবিলের ওপর পেনটা ফেলে দিয়েই দেখি না-দেখি না ভাব করে চলে যাচ্ছিল। নরেনবাবু গম্ভীর মুখটা তুলে বললেন—এই শোন। ছেলেটা একটু ভয়ে-ভয়ে কাছে আসতেই বাঁ হাতটা দিয়ে কষিয়ে একটা চড় দিলেন গালে। বললেন—কতদিন বারণ করেছি, আমার টেবিলে জরুরি সব জিনিস থাকে, হাত দিবি না। অ্যাঁ, কতদিন বারণ করেছি?

চড় খেয়ে ছেলেটার বোধহয় মগজ নড়ে গিয়েছিল, কথা বলতে পারল না। ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে হাত মুঠো করে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভিতর দিকের দরজার কেলেকিষ্টি নোংরা পর্দাটা সরিয়ে চলে গেল। নরেনবাবু নির্বিকারভাবে আবার আমার ছক দেখতে লাগলেন। না, খুব নির্বিকারভাবে নয়, মাঝে মাঝে দেখছিলাম তিনি আড়চোখে ভিতর বাড়ির দরজাটার দিকে তাকাচ্ছেন। ওদিক থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করেছিলেন বোধহয়। ছেলেকে চড় মারাটা বোধহয় তাঁর ভুলই হয়েছে।

ভুল যে হয়েছে সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেন্ড বাদেই। পর্দার ওপাশ থেকে আচমকা এক বিদ্রোহী গলা অত্যন্ত থমথমে স্বরে বলে উঠল—ব্যাপার কী, দাসুকে মেরেছ কেন? গালে গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

নরেনবাবুর বাইফোকাল ঝলসে উঠল, গম্ভীর গলায় বললেন—শাসন করার দরকার ছিল, করেছি। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে নাকি! যাও, ভিতরে যাও।

—ইঃ, শাসন! সংসারের কুটোগাছটি নাড়ো না, ছেলেপুলে কোনটা পড়ল, কোনটা কাঁদল তার হদিস জানো না, শাসনের সময় বাপগিরি!

বাইফোকালটা পর্দার দিকেই ফোকাস করে মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন নরেনবাবু। আমি বাইরের লোক, তবু আমার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে বলেও তিনি খুব একটা সংকোচ বোধ করছেন, এমন মনে হল না। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমার টেবিলের জিনিস তোমাদের কতদিন হাত দিতে বারণ করেছি। এর একটা কাগজপত্র হারালে কী ক্ষতি হবে তা মুখ্যুরা বোঝে না। ফের যদি কখনও কেউ হাত দেয় তো হাত ভেঙে দেব।

—ইঃ, মুরোদ কত! গায়ে হাত দিয়ে দেখো ফের, ও সব ভণ্ডামির জিনিস নুড়ো জ্বেলে পোড়াব। হাবাগোবা সব লোক ধরে এনে দিনমান ধরে কুষ্ঠী না কপাল দেখে ঝুড়ি ঝুড়ি বানানো কথা বলে যাচ্ছে। জ্যোতিষে ক'পয়সা আসে শুনি? বেশির ভাগ লোকই তো ছোলাগাছি দেখিয়ে সরে পড়ে। কবে থেকে বলছি, মহিন্দির বুড়ো হয়ে দেশে চলে যাচ্ছে, তার কয়লার দোকানটা ধরে নাও, কানু পানু বসে আছে, তারা দেখবে'খন। তা সংসারের যাতে সুসার হয় তাতে আবার কবে উনি গা করলেন! আছেন কেবল তেজ দেখাতে!

বাইফোকালটা খুব হতাশভাবে নেমে পড়ল টেবিলে। নরেনবাবু শুধু বললেন—মেয়েমানুষ যদি সব বুঝত তা হলে দুনিয়াটা অনেক সুস্থ থাকত। বোকা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করার মতো অভিশাপ আর হয় না, যাও, তুমি ভিতরে যাও।

—আর তুমি বুঝি বুদ্ধির পাইকিরি নিয়ে বসে আছ! সংসারে মাসান্তে ক'টা টাকা ফেলে দিয়ে অমন ফুল-ফুল বাবুগিরি করে বেড়াতে পারলেই খুব বুদ্ধি হল, না! বোকা মেয়েছেলে! বোকা বলেই তোমার মতো আহাম্মকের ঘর করতে হয়। বুদ্ধিমতী হলে তিন লাথি মেরে সংসার ভেঙে চলে যেত।

বাইফোকালটা আরও নত হয়ে পড়ে। নরেনবাবুর এই বিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হই।

পর্দার ওপাশ থেকে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর সরে গেল। গৃহকর্ম রয়েছে। নরেনবাবু ছক থেকে মাথা তুলে আমাকে বললেন—রবিটা নীচস্থ রয়েছে। মঙ্গলটা পড়ল তৃতীয়ে। একমাত্র শনিটাই যা স্বক্ষেত্রে পঞ্চমে।

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এ সবই আমার জানা কথা। রবি নীচস্থ, শনি পঞ্চমে।

নরেনবাবু বললেন—কেতুটাই ডোবাচ্ছে। বাঁদিকের ঘরে পড়ল কি না! বাঁদিকে কেতু ভাল নয়।

আমি হতাশ বোধ করতে থাকি।

উনি মাথা নেড়ে বললেন—কার্তিক মাসে জন্ম হলে বড় মুশকিল। আমারও তাই। রবিটা নীচে পড়ে থাকলে কী করে কী হবে!

—কিছু হবে না?

নরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলেন—এখনই সব বলা যাবে না। আগে নবাংশটা দেখি। সময় লাগবে। আপনি বরং ও হপ্তায় আসুন। ততদিনে করে রাখব। তবে বিদেশযাত্রার একটা যোগ আছে। নবাংশটা না করলে বোঝা যাবে না। পাঁচুবাবু আপনার কে হন?

—খুব দূর সম্পর্কের দাদা।

নরেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—অনেককাল দেখি না পাঁচুবাবুকে। আগে খুব আসতেন। উনি আমার প্রথম দিককার ক্লায়েন্ট!

—উনিই আপনার কথা বলেছিলেন। বলতে গেলে উনিই পাঠিয়েছেন আমাকে।

নরেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন—বরাবর উনি লোক ধরে নিয়ে আসতেন আমার কাছে। ওঁর ধারণা ছিল, আমি খুব বড় জ্যোতিষী হব। জ্যোতিষীর যে ধৈর্য স্থৈর্য দরকার, আর হিসেবের মাথা, সে সব আমার ছিলও। কিন্তু নিজের কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছিলাম, আমার দাম্পত্য জীবনটা ভাল হবে না। হলও না। পুরুষমানুষের বউ যদি ঠিক না হয় তো তার সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। এই যে রাস্তায় ঘাটে অতি সাধারণ সব মানুষকে দেখেন তাদের মধ্যে অনেকের ছক বিচার করলে দেখবেন, অনেকেরই বড় বড় সব মানুষ হওয়ার কথা। কেউ নেতা, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক। বেশিরভাগেরই হয় না কেবল ওই বউয়ের জন্যই। বউ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। পাঁচুবাবুরও খুব আশা ছিল আমার ওপর। ওই সংসারের জন্যই হল না। তা পাঁচুবাবু আজকাল আর আসেন না কেন?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি—তাঁর আর ভবিষ্যৎ কিছু নেই। হাসপাতালে পড়ে আছেন। মৃত্যুশয্যা।

নরেনবাবু বাইফোকাল খুলে রেখে চোখ দুটো ধুতির খুঁটে মুছলেন। আবার বাইফোকাল পরে নিয়ে বললেন—বয়সও হল। সত্তর-পঁচাত্তর তো হবেই।

—তা হবে।

—কোন হাসপাতালে?

—কবিরাজি হাসপাতাল, শ্যামবাজারে।

নরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—চিনি।

আমি বলি—যাবেন নাকি একদিন দেখতে? খুব খুশি হবেন তা হলে। ওঁর তো কেউ নেই। চেনা লোক কেউ গেলে খুব খুশি হন।

নরেনবাবু উদাস হয়ে বলেন—আমার সময় কোথায়!

বলে একটু চুপ করে থাকেন উনি তারপর টেবিলের ওপর সেই অসম্পূর্ণ কোষ্ঠীপত্রটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললেন—গিয়েই বা হবে কী? মরুণে মানুষকে দেখতে আমার ভাল লাগে না, মন খারাপ হয়। অনেককাল দেখিনি, ওঁকে খামোকা এখন দেখে মন খারাপ করার মানে হয় না। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা হয় হোক। সেই ভাল। হয়েছে কী?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম—বুড়ো বয়সের নানা রোগ। ভীষণ খেতে ভালবাসতেন, সেই থেকে ডায়াবেটিস হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, ক্যানসারও দেখা দিয়েছে। বাঁচবেন না, তবে এখনও বেশ হাসিখুশি আছেন।

নরেনবাবু এই প্রথম একটু হাসলেন—পাঁচুবাবু বরাবরই সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যবান। মরাটা নিয়েই আমি ভাবি। কবে, কোথায়, খাবি খেতে খেতে মরব। পাঁচুবাবুর মতো আমি তো আর সদানন্দ পুরুষ নই। একবার এই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন থেকে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন শোভাবাজার অবধি নিখুঁতি খাওয়াবেন বলে। অমন নিখুঁতি নাকি কোথাও হয় না। চাচার হোটেলে বহুবার মাংস খাইয়েছেন। নানান শখ শৌখিনতা ছিল তাঁর যা দেখে বোঝা যেত ভিতরটা সব সময়ে রসে ডগমগ। প্রায়ই বলতেন, আশি বছর বয়সের পর ধর্মকর্মে মন দেব। খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল, আবার মরতেও খুব পরোয়া ছিল না। প্রায়ই কেওড়াতলা নিমতলা সব ঘুরে বেড়াতেন। কত সাধুসঙ্গ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে টাকা খরচ করতেন। সেই পাঁচুবাবু মৃত্যুশয্যায়। এ কি ভাবা যায়?

পাঁচুদার কথায় আমিও দুঃখিত হয়ে পড়ি। বলতে কী, কলকাতা শহরটা পাঁচুদাই আমাকে চিনিয়েছিলেন। সদানন্দ মানুষ। সংসারে কারও পরোয়া ছিল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের ল্যান্ড রেভিনিউতে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে বাজার ছিল সস্তাগণ্ডা। পয়সার তাঁর ছড়াছড়ি যেত। মনে পড়ল গতকালও পাঁচুদা একটু তেলমুড়ি খাওয়ার বায়না করেছিলেন। সেটা যে খাওয়া বারণ তা নয়। তাঁর স্টেজ-এ কিছুই বারণ নয় আর। যা খুশি খেতে পারেন। ডাক্তাররা অবস্থা বুঝে সব বারণ তুলে দেয়। কিন্তু পাঁচুদার তেলমুড়ি খাওয়ার পয়সা নেই এখন আর।

নরেনবাবু ফের বাইফোকালটা খুলে চোখ মুছে বললেন—নবাংশটা করে রাখবখন। কিন্তু আমি বলি কী, আপনি বরং এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা দেখুন। এক ঝলক বিচার করে যা দেখেছি, হয়ে যাবে।

একটু শিউরে উঠে বলি—বলছেন?

—বলছি।

একটা ছোট শ্বাস ফেলে উঠে আসি।

বস্তুত সদ্য সদ্য জীবনের দশ-দশটা বছর নষ্ট করে আমি এই সে দিন সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেছি। কিন্তু সে কথা নরেনবাবুকে বলার কোনও মানে হয় না। বিদেশে যাওয়াটাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমি তাদের দলে নই।

খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটে ছিল। ভিখিরির ছেলে অল্প বয়সেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে শেখে। কারণ তাকে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে না। লক্ষ করে দেখেছি, শীতে বর্ষায় কাঙাল গরিবের শিশু জল নিয়ে খেলা করে, ধুলো বালিতে গড়ায়, যা খুশি খায়, অসম্ভব নিষ্ঠুরতায় মারপিট

করে। সেসবের প্রতিরোধশক্তি ওদের মধ্যে আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। নিদারুণ অভাব ওদের চারপাশের রুক্ষতাকে প্রেমহীন ভালবাসাহীনভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়ে দেয়, অল্প বয়সেই তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধুলো-খেলা করতে করতে উঠে গিয়ে ভিক্ষের হাত পাতে, বিয়েবাড়ির ফুটপাথে রাস্তার কুকুর তাড়িয়ে খাবার খুঁটে আনে, দুধের শিশু মাকে ছেড়ে সারাদিন একা পড়ে থাকে, কাঁদে না। ওই তাদের খেলা ও জীবন। মা-বাবা মরলে ছেলেমেয়ের শোক বা কদাচিৎ সন্তান মারা গেলে মায়ের শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অকারণ মায়া তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না কখনও।

ভিখিরিদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার মানে এই যে, আমাদের জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরি করে দেয়। শৈশবে আমার চেতনা হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিলাম, যে খিদে পেলেই খাবার এসে হাজির হয় না। এও জানতাম, ছোটখাটো ব্যথা বেদনা, খিদে বা মারধোরে কাঁদতে নেই। কান্না বৃথা, কেউ সেই কান্না ভোলাতে আসে না। এও জানতাম, আমার বাবার থাপ্পড়ের জোর খুব বেশি, মার নিস্পৃহতা ছিল পাহাড়ের মতো অটল। উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরই ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা খুব কম ছিল না। ওই অত লোকের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের আত্মসচেতনতাও অনেক কমে গিয়েছিল। রাণাঘাটের কাছে এক ক্যাম্পে তখন থাকি, অনেক উদ্‌ভ্রান্ত লোক চারিদিকে, খাওয়া-পরার কোনও ঠিক নেই। মচ্ছবের মতো দু বেলা কারা যেন খিচুড়ি খাওয়াতে আসে। খাওয়া বলতে ওইটুকুই। সারাদিন বহুবার খিদে পেত, খিদে মরে যেত। প্রথমে কাঁদতাম খুব, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারতাম কান্নার মূল্য দেওয়ার কেউ নেই। বাবার এক খুড়ি ছিল দলে, খুনখুনে বুড়ি, সেই ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর চোখের কোল ছিল ফোলা, চোখ ঘোলাটে, চোখের দোষেই সব সময়ে অশ্রুপাত করতেন, সেটা কান্না ছিল না। সেই ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বড় একটা পাত্তা দিত না। দরমার বেড়া দেওয়া দমবন্ধ সেই ঘরে আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতামও না। অনেক আমাদের বয়সি ছেলেমেয়ে জুটেছিলাম সেইখানে। ক্রমে খিদে ভুলে খেলায় মেতে থাকতে শিখেছিলাম। মার্বেল নেই, লাট্টু নেই, ঘুড়ি লাটাই জোটে না, তবু কত রকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেলা আমরা তৈরি করে নিতাম। মাটির চাড়া ছুঁড়ে সিগারেটের খালি প্যাকেট জিতে নেওয়ার খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, দড়ি পাকিয়ে বল তৈরি করে তাই দিয়ে ফুটবল। দেশের বাড়িতে আমরা নাকি তিনবার ভাত খেতাম, তা ছাড়া সারাদিন ধরে মুড়ি মুড়কি, আমটা জামটা তো ছিলই। সেই সব ভুলতে শিশুদের দেরি হয়নি। আমরা খুব চট করে রুক্ষতাকে টের পেয়ে তা গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রাণাঘাটে আমরা অবশ্য খুব বেশিদিন থাকিনি। সেখান থেকে হাবড়া, ব্যান্ডেল, গোসাবা হয়ে আমরা অবশেষে কলকাতায় আসি। বাবা পূর্ববঙ্গে জমির আয় থেকে সংসার নির্বাহ করতেন, খুব বেশি লেখাপড়া বা বৃত্তিগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। চাকরি-বাকরি পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না, উদ্যোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং উদ্বেগে তিনি আরও অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহ-উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সারাদিন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতেন আর বাড়ি ফিরে কেবলই ফিসফাস করে পরামর্শ করতেন সকলের সঙ্গে। পরামর্শের শেষ ছিল না। কার্যকর কিছুই হত না। আমরা কাছাকাছি বয়সের চার ভাই, আর তিন বোন মিলে সাতজন, মা বাবা ঠাকুমা, এক কাকা কাকিমা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে, আবার এক ছোট কাকা—এই বিশাল পরিবার বিনা টিকিটে ট্রেনে, হাঁটাপথে কিংবা যেমন-তেমন ভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। কলকাতায় আমরা দমদমের কাছে এক খোলা মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা-কাকাদের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল, ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল, ওইভাবে যৌথ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করলে আরও মুশকিলে পড়তে হবে। মেজোকাকা তাঁর পরিবার নিয়ে একদিন ভিন্ন হয়ে গেলেন। শোনা গেল, আদি সপ্তগ্রামে তাঁর এক খুড়শ্বশুরের জমিজমা আর কলাবাগান আছে, তদুপরি তিনি একটিমাত্র সন্তানকে হারিয়ে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কাকাকে তিনি জমি বাগান তদারকির কাজ দিয়েছেন। কাকা সপরিবারে চলে গেলে পরিবারের লোকের চাপ কিছু কমল। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের বয়সী কাঙাল ছেলেপুলে জুটে যায়। আমরা খুব খেলি। বলতে কী, সেই সময়ে একটা বড়সড় ছেলে আমাদের

ভিক্ষে চাইতে শিখিয়েছিল। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে আমরা বড় রাস্তায়, বাজারে এবং রেল স্টেশনে বহুবার ভিক্ষে করেছি। তবে কারও বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করত। আমরা বড়জোর পথচলতি মানুষের কাছে হাত পেতে বলতে পারতাম—দুটো পয়সা দেবেন? পয়াস পেলে কুপথ্য কিনে খেতাম। ছোটখাটো চুরি করতাম কখনও সখনও। লাউটা, মুলোটা, ঘটি কি বাটি পেলে বেচে দিতাম। রেলের কামরায় উঠে খুঁজতাম যাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস। আমাদের বখে যাওয়ার ব্যাপারটা মা-বাবা কদাচিৎ লক্ষ করেছেন। মা দু-দুটো কোলের মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত, বাবা অভাবে পাগল, ছোটকাকা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ। তিনি মানুষটা ছিলেন বড় ভাল, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। নীরবে তিনি তাঁর সঙ্গে আনা কিছু পুরনো পড়ার বই বারবার পড়তেন। তাঁর তাড়া খেয়ে আমরা চার ভাই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম। লেখাপড়া আমার খুব খারাপ লাগত না, অক্ষর চেনা রিডিং পড়া যোগবিয়োগ ইত্যাদির মধ্যে আমি কিছু নতুন রকম খেলার রহস্য টের পেয়েছিলাম। ছোটকাকার বিষণ্ণতার গভীরতা আমরা টের পাইনি, যখন পেলাম তখন সেই আত্মহননকারীর দেহটি এক শীতের ভোরে দমদম জংশনের কাছে রেল লাইনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে ছিল। ছোটকাকার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের জনসংখ্যা কমল, আরও কমল যখন আমার বড় দুই ভাই পরপর টাইফয়েড আর উদরিতে মারা যায়। এইসব মৃত্যু খুবই শোকাবহ বটে কিন্তু তবু বলি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত জীবনে এই রকম শোক যতখানি ধাক্কা দিতে পারত ততটা হয়নি। ক্যাম্পে মৃত্যু দেখে আমরা অভ্যস্ত। শুধু সেই খুনখুনে বুড়ি ঠাকুমা চোখের দোষেই হোক আর শোকেই হোক অবিরল অশ্রুপাত করে বিলাপ করতেন। মা-বাবা অচিরে সামলে উঠলেন। শোকের সময় কই?

শুনতে পেলাম বাবা কন্ট্রোলের কাপড়ের একটা ব্যবসা পেয়েছেন। সেটা ভাল না খারাপ এ সব বিচার তখন মাথায় আসে না। একটা কিছু পাওয়া গেছে, একমাত্র সংবাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েক পদ রান্না হয়, একটু নতুন জামাকাপড়ের মুখ দেখি। বাবা একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত কিনে ফেললেন। অতিলোভে বোধহয় তাঁতি নষ্ট হল। সে ব্যবসা বাবার চেয়ে বিচক্ষণতর লোকেরা হাতিয়ে নেয়। একটা রেশনের দোকানে বাবা কিছুকাল চাকরি করলেন। অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। এর পরই বাবা এক বড় উকিলের মুহুরি হলেন। তার পরের পর্যায়ে বাবা স্বাধীনভাবে শিয়ালদা কোর্টে বসে কোর্ট ফি পেতে লাগলেন, দলিল তৈরি, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির দালালি করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দীনদরিদ্রের মতো, খুবই সামান্য খাওয়া-পরার মধ্যে একরকমের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। এক সেই বুড়ি ঠাকুমার অনুল্লেখ্য মৃত্যু ছাড়া আর তেমন অঘটন কিছু ঘটেনি। আমি ছোটকাকার কাছে শেখা সামান্য লেখাপড়ার ব্যাপারটি ভুলিনি। তিনি মারা গেলে তাঁর বইগুলো আমার দখলে আসে। সেগুলো নিয়েই আমার অনেকসময় কাটত। বাবা কোর্টের কাজ পাওয়ার পর, প্রায় দশ বছর বয়সে আমি দমদমের একটা ওঁছা স্কুলে ভর্তি হতে যাই। সেই স্কুলে যে যায় তাকেই ভর্তি করা হয়, যে ক্লাসে যার খুশি। নামকোবাস্তে একটা ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র। আমি যেতেই তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, আমি কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাই। আমি বললাম সিক্সে। তাঁরা কয়েকটা ট্রানশ্লেশন জিজ্ঞেস করলে আমি চটপট বলে দিই। একজন মাস্টারমশাই বললেন—বাঃ, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট! আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। পরের পরীক্ষা থেকে আমি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকি। স্কুলটা যথার্থ খারাপ বলেই আমার মতো মাঝারি ছাত্রের পক্ষে ফার্স্ট হওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছিল, এভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। প্রায় দিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ক্লাস প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকত মাস্টারমশাইয়ের অভাবে। পড়ানো ছিল খুবই দায়সারা গোছের। আমি তাই বাড়িতে পড়তাম। দমদমের কাছে আমাদের কলোনির পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। চুরি, গুণ্ডামি, মারপিট, জবরদখল, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল ঝগড়া এ সব ছিল আমাদের জলভাত। এই পরিবেশ সহ্য করতে পারতেন না আমার ছোটকাকা। তা ছাড়া জীবনের হতাশার দিকটাও তাঁর সহ্য হয়নি, তাই তাকে মরতে হয়েছিল। আশ্চর্য এই, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁকে আমার বড় বেশি মনে পড়তে থাকে এবং আমার জীবনে তিনিই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। সেই উদ্বাস্তু পল্লীর সবচেয়ে অশ্লীল গালিগালাজ আমার একসময় ঠোঁটস্থ ছিল, বখামির চূড়ান্ত একসময়ে আমি করেছি। কিন্তু ক্রমে আমার এই পল্লীর কুশ্রীতা থেকে মানসিক মুক্তি ঘটে। আমি আমার আর তিন ভাইবোনকেও

প্রাণপণে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করতাম। বাবাকে বলতাম—চলুন, আমরা অন্য কোথাও বাসা করি। বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন—তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লেখাপড়া করে। আর কিছুদিনের মধ্যেই জমির স্বত্ব আমরা পেয়ে যাব। মাগনা জায়গা ছেড়ে আহাম্মক ছাড়া কেউ যেতে চায়?

আমি বাবার মতো করে বুঝতে শিখিনি। জমির জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যই জমি। সেই মানুষই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষকেই যদি নীতিহীনতায় পশুত্বে নেমে যেতে হয় তো জমিটুকু আমাদের কতটুকু অস্তিত্বের আশ্রয় হতে পারে? অবশ্য বাবা একটা যুক্তিসিদ্ধ কথাও বলতেন—দেখো, পরিবেশ থেকে পালানোর চেষ্টা কোরো না। সর্বত্র পরিবেশ একই রকম। যদি পারো, সাধ্য থাকে তো পরিবেশকে শুদ্ধ করে নাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ, আদর্শের কথা ভিতরে সাঁ করে ঢুকে তীরের মতো গেঁথে যেত। তার থরথরানি থাকত অনেকক্ষণ। বুঝতাম, সত্যিই কোথায় যাব? বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে এর চেয়ে ভাল বা সুস্থ পরিবেশ খুব একটা নজরে আসেনি তো? আমাদের কলোনিতে দু-চারজন ভাল লোক ছিলেন ঠিকই। তাঁরা দশের ভাল করতেন, উপকার করে বেড়াতেন, ঝগড়া কাজিয়া মেটাতেন, তা সত্ত্বেও বলতে পারি তাঁরা আমাদের মধ্যে এমন কিছুর সঞ্চার করতে পারেননি যার দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সংবর্ধিত হই। এ বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যায়, ও বাড়ির ছেলে কালোবাজারি করে, অমুকের বউ পরপুরুষের সঙ্গ করে—এই ছিল আমাদের নিত্যকার ঘটনা। প্রচণ্ড অভাবের চাপে মানুষ কত কী করে! এই সব মরিয়া ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া মানুষের কাছে ধরবার ছোঁবার মতো কোনও বাস্তব আদর্শ কেউ দিতে পারেনি। ভাল কথা সবাই বলছে, দেশ জুড়ে বক্তৃতার অভাব নেই, কিন্তু কেউ জানে না কোন পথে, কোন আদর্শে মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তার ওপর নানা বিরুদ্ধ মতেরও জন্ম হচ্ছে রোজ। সেই মতামতের ঝড়ে আমরা আরও উদভ্রান্ত। কোন দিকে গেলে ঠিক হয় তার বুঝতে পারি না। তবু দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে যাই। এর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই, ওর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই। কে কেমন বলল সেইটে নিয়ে মাথা ঘামাই। এদিকে দরমার বেড়া বা চালের টিন পাল্টাতে আমাদের জেরবার হয়ে যায়, পুজোর জামাকাপড়ের জন্য বাবাকে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখি। পুজো উপলক্ষে জামাকাপড় কেনা হয় বটে, কিন্তু বছরে ওই একবারই আমাদের যা কিছু কেনা হয়। সেটা না হলে লজ্জা নিবারণের সমস্যা। আমরা এ সব নিয়ে ব্যস্ত; এর চেয়ে দূরের বস্তু অর্থাৎ পুরো দেশ কিংবা মানুষের ভবিষ্যৎ—এ সব আমাদের ভাববার সময় নেই।

প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করা গেল। আমাদের পরিবারে এ নিয়ে খুব একটা হইচই করার অবস্থা আমাদের নয়। বাতাসা লুট দেওয়া হল মাত্র। বাবা কিছু বেসামাল রইলেন কয়েকদিন। তাঁর সেজো ছেলে মানুষ হচ্ছে, এরকম একটা বিশ্বাস তাঁর হয়ে থাকবে। তখন তিনি প্রায়ই ছোটকাকার সঙ্গে তুলনা করে বলতেন—প্রভাসটা ঠিক ছানুর মতো হয়েছে। ছানুও বেঁচে থাকলে আজ কত বড় মানুষ হত। এই তুলনায় কেন জানি না আমি অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ করতাম। কৈশোরোত্তীর্ণ ছোটকাকা কবে মরে গেছেন, তবু আমার ভিতরে ওই মানুষটি এক বিগ্রহের মতো স্থির হয়ে থাকে। ওই সৎ, নিরীহ, মেধাবী মানুষটিকে ভালবাসা আমার শেষ হয়নি। আমার হতভাগ্য পরিবেশে যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কোমল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, একটা জীর্ণ হলুদ চাদরে খালি গা ঢেকে খুপরির মধ্যে জানালার ফুটোর ধারে একমনে গণিতের বই খুলে বসে আছেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না, খিদের কথা বলতেন না, কখনও কোনও অসুবিধে বা অভাবের অভিযোগ ছিল না। অল্প কথা বলতেন। কখনও কখনও আমাদের পড়ানোর পর গল্প শোনাতেন, কিংবা চুপ করে আমাদের নিয়ে বসে থাকতেন। শুনতে এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে কোনও মানুষই তাঁর মতো অত অল্প আচরণের ভিতর দিয়ে অত শেখাতে পারেনি।

বি.এস-সি পর্যন্ত পাশ করতে আমার খুব কষ্ট হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিলাম, পরীক্ষার আগে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। তার কারণ, আমরা ভাই-বোনেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাহিদা বাড়ছে, বাবার রোজগার বাড়ছে না। ফলে আমাকে বেশ কয়েকটা টিউশানি নিতে হয়। অপুষ্টির ফলে আমার শরীর ভাল ছিল না, চোখের দোষে মাথা ধরত, লো প্রেসার ছিল, বেশি রাত জেগে পড়াশুনো

করতে গিয়ে স্নায়ুর দোষেই বুঝি খুব খিটখিটে আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। মাসান্তে আমার রোজগারের টাকা তখন সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। কম বয়সে এ সব দায়িত্ব নিয়ে বেশ বুড়িয়ে গেছি অল্প বয়সেই। সে এক রাহুগ্রস্ত যৌবন। ছোটভাইটা বড় হতেই বুঝলাম তার লেখাপড়ার মাথা নেই। বোন দুটোরও প্রায় একই দশা। টেনেটুনে স্কুল ফাইনালটাও যদি পাশ করানো যায় এই ভরসায় আমি ছোটভাইটার পিছনে খুব খাটতাম। সে বখাটে ছেলে ছিল না, আমাকে ভয়ও পেত। কিন্তু তার মাথা পড়াশুনো নিতে পারত না। অবোধ শিশুর মতো সে চেয়ে থাকত আমার দিকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারতাম তাকে। মনে হত এই নির্বোধদের ভরণপোষণ করাই বুঝি হবে আমার একমাত্র কাজ সারাজীবন। তাই ওই রাগ ও বিরক্তি। মন ভাল থাকত না। আই এস-সি-র রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমার। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের লিস্টে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ব্যয়সাপেক্ষ পড়াশুনোর অবস্থা নয় বলে পড়িনি। বি. এস-সি-র অর্নাসটাই ছিল আশা-ভরসা। কিন্তু ফাইনালের আগে বুঝতে পারলাম, হবে না। আমার মনঃসংযোগ নেই, ধৈর্য নেই, শরীরেও সয় না। অনার্স ছেড়ে বিষণ্ণ চিত্তে পরীক্ষা দিয়ে দেদার নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনে পাশ করলাম। এম. এস.-সি পড়া হল না। একটা চাকরি পেয়ে গেলাম ডবলিউ. বি. সি-এস পরীক্ষা দিয়ে। তুমুল আনন্দিত হল আমার পরিবার। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, ফিজিক্সের অনার্সটাও হল না, জীবনের অনেক বড় সার্থকতা আমার হাতের নাগাল দিয়ে পালিয়ে গেছে, সেই তুলনায় সরকারি চাকরিটুকু আমাকে কী আর দিতে পারে? তাই তখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের প্রতি এক প্রচণ্ড আক্রোশও তখন থেকে জন্ম নেয়। এরা আমাকে এদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে বড় হতে দিচ্ছে না, আমার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ ঘটতে দিচ্ছে না।

এই নির্মম আক্রোশ থেকেই তলায় তলায় আমি গোপনে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। জানতাম, আমি চলে গেলে এদের সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটবে, সরকারি চাকরির নিশ্চিত আয় এদের আশ্রয় দেবে না। তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে বড় বেশি নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। জার্মানিতে প্রথম একটি চাকরি পেয়ে যাই, তারা যেতে লিখল। গোপনে পাসপোর্ট করলাম, ভিসার আবেদন জমা দিলাম। বাড়ির কেউ জানল না। কিছু টাকা জমানো ছিল দু বছর চাকরির। সেই টাকা দিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বাড়িতে খবর দিলাম। এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। সকলেই এক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। তারা যতদূর সাফল্যের কথা ভাবতে পারে আমি তো ততদূর সফলতা অর্জন করেছি। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অফিসারের সরকারি চাকরি করি। গেজেটে নাম ওঠে, আমার জন্য সচ্ছল পরিবার থেকে পাত্রীর খবর আসছে। মা-বাবাও উদ্যোগ করছেন। এর মধ্যে এ কী! তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি এতদূর হৃদয়হীন হতে পারি তাদের ধারণা ছিল না। অবশ্য কেউ কোনও জোরালো আপত্তি তুলল না। আমি অবশ্য তাদের বোঝালাম, আমার এবং সকলের ভবিষ্যতের জন্য এটা দরকার। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। মা তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। বোনেরাও খুশি হয়নি। কেবল ভাইটা খুশি হয়েছিল, দাদা না থাকলে তাকে আর ওরকম প্রচণ্ড মারধোর বকুনি সহ্য করতে হবে না।

জার্মানিতে চলে গিয়েছিলাম দশ বছর আগে । তারা আমাকে শ্রমিকের চাকরি করাত। বহু কষ্টে অনেক চেষ্টায় আমি গেলাম আমেরিকায়। মোটামুটি ভাল খেতাম, পরতাম, মাঝারি চাকরি জুটেছিল। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? তার কী হবে? কেবল ভাল খাওয়া-পরার জন্য তো আমি এতদূর আসিনি। কিছু একটা শিখে, জেনে যেতে হবে যা আমাকে অনেক উঁচুতে তুলে দেবে। অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়েই আমার সময় ফুরিয়ে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হল না । কমপ্রেসর মেশিন সম্পর্কে শিখবার জন্য অবশেষে আমি চলে আসি সুইজারল্যান্ডে। ব্যল শহরে দীর্ঘকাল লেগে থাকলাম একটা কারখানায়। বেতনের প্রচণ্ড অসাম্য। জার্মান, ইটালিয়ান শ্রমিকেরা বেশি অঙ্কের পে-প্যাকেট পায়, আমরা অনেক কম। তবু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। কিন্তু অতবড় কম্প্রেসর তৈরির কারখানার কাজ আমি একা শিখব কী করে। আমার মৌলিক কারিগরিবিদ্যা নেই, পরিকল্পিতভাবে আমি আসিওনি। কেবল ভসভসে আবেগ সম্বল করে এসে চাকরিতে ঢুকেছি। বুঝেছি, কেবল চাকরিই সার হল। এই হতাশা কাটাতে আমি এক জার্মান মেয়েকে দু বছর বাদে বিয়ে করি। তার

দেড় বছর বাদে সে ছেড়ে চলে যায়। আর ততদিনে দশ-দশটা বছর পার হয়ে গেল। খবর পেয়েছি, বাবা-মা এখনও কোনওক্রমে বেঁচে আছে, ভাই রেলের পোর্টার, বোনেরা যে যার রাস্তা দেখেছে। হতাশার ভরে আমি একদিন ফেরবার প্লেনে চাপলাম।

অলকা

ভোরের প্রথম আলোটি পুবের জানালা দিয়ে এসে আমার জয়পুরি ফুলদানিটার ওপর পড়েছে। ফুলদানিতে কাল সন্ধের রজনীগন্ধা একগোছা। ফুল এখনও সতেজ। কালকের কয়েকটা কুঁড়ি আজ ফুটেছে। সাদা ফুলের ওপর ভোরের রাঙা আলো এসে পড়েছে, জয়পুরি ফুলদানিটার গায়ে চিকমিক করে আলো। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই ফুলদানি, তাই আয়না থেকেও আলোর আভা এসে ওকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেছে। তিন আয়নার ড্রেসিং টেবিল ফুলদানি আর ফুলের তিনটে প্রতিবিম্ব বুকে ধরে আছে। একগোছা রজনীগন্ধা চারগোছা হয়ে কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে!

আমার বদ অভ্যাস, খুব ভোরে আমি উঠতে পারি না। আমার বাপের বাড়ির দিকে সকলেরই এই এক অভ্যাস। কেউ ভোরে ওঠে না। আমাদের বাপের বাড়িতে সবার আগে উঠত আমার বুড়ি ঠাকুমা। ভোরে চারটেয় উঠে খুটুর-খাটুর করত, জপতপ করত। আর তারপর সাড়ে সাতটা বা আটটা নাগাদ আর সবাই। এ আমাদের ছেলেবেলার অভ্যাস। বিয়ে হওয়ার পর এই বদ অভ্যাস নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাকে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব রাত থাকতে উঠে ঘর-গেরস্থালির কাজ শুরু করে দিত। প্রথম প্রথম নতুন বউ-পনা দেখিয়ে আমিও ভোরে উঠতাম, কিন্তু তাতে শরীর বড় খারাপ হত। সারাদিন গা ম্যাজম্যাজ, ঘুম-ঘুম, অস্বস্তি। কপালক্রমে আমার বিয়ে হয়েছিল এক ধার্মিক পরিবারে। ধর্ম ব্যাপারটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আমার বাপের বাড়িতে অবশ্য একটু লক্ষ্মীর পট, কালীর ছবি, বালগোপাল বা শিবলিঙ্গ দিয়ে একটা কাঠের ছোট্ট ঠাকুরের সিংহাসন ছিল এবং তার সামনে ঠাকুমা রোজ একটু ফুল জল বাতাসাও দিত। কিন্তু ওইটুকুই। আমাদের আর কারও ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও উৎসাহ ছিল না। বড় জোর বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়ত মা, শনিবারে কোনও-কোনওদিন লুট দেওয়া হত। কিন্তু এ সবই ছিল দায়সারা। আমাদের ঠাকুরঘরটাই ছিল শোওয়ার ঘর। সেই ঘরে সবাই জুতো পরেই ঢুকত আর ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁ দিকে যে আলনা ছিল তার নীচের তাকে জুতো রাখত সবাই। বাবার গলায় পইতা বলে কোনও বস্তু ছিল না, আমার দাদা বা ভাইদের কারওরই পইতে-টইতে হয়নি। আমাদের কুলগুরু বংশের শেষ গুরু ছিল কেশব ভট্টাচার্য। আমার বয়স যখন তেরো তখন কেশবের বয়স বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে লোকটা ছিল ডাকপিওন। মাঝেমধ্যে সে আমাদের বাড়ি এলে আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। সে কুলগুরুর তোলা আদায় করতে বেরোত। যদিও তার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তার কাছে ঠাকুমার পর আর কেউ মন্ত্র নেয়নি। কিন্তু ঠাকুমা তাকে ভীষণ শ্রদ্ধাভক্তি করত, ওই পুঁচকে কেশবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের ধুলো নিত, নিজে উপোস থেকে সারাদিন রান্নাবান্না করে কেশবকে খাওয়াত, মোটা দক্ষিণা দিত, পালে-পার্বণে ধুতি-চাদর দেওয়া তো ছিলই। বলতে কী, কেশব বেশ সুপুরুষ ছিল। নাদুস-নুদুস চেহারা, ফরসা রং, চোখদুটো খুব বড় বড়। কিন্তু সে সাজতে জানত না, সাদামাটা ধুতি, ময়লা পিরান, খোঁচা দাড়ি নিয়ে আসত। সে এসে খুব তাকিয়ে দেখত আমাকে। আমরা যদিও তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম, সে কিছু মনে করত না। মান-অপমান বোধ তার খুবই কম ছিল । বরং সে মাঝে মাঝে ভ্যাবলার মতো হাসত। ধর্মের কথা সে জানতও না, বলতও না। সে এলেই আমার দাদা অভিজিৎ চেঁচিয়ে বলত—ওই কেশবশালা এসেছে মাসকাবারি নিতে। ও কেশব, আজ আমাদের জামাকাপড় কেচে দিয়ে যাবি, বাসন মেজে দিয়ে যাবি। শুনলে ঠাকুমা রাগারাগি করত, কিন্তু কেশব নির্বিকার। সে বরং কখনও-সখনও এমন কথা বলত—দূর শালা, গুরুগিরির বড় ঝামেলা। সব জায়গায় লোক হুড়ো দেয়।

আমি বাসি কাপড় ছাড়তাম না, পায়খানার কাপড় পালটাতাম না, এঁটোর বিচার ছিল না। ভাত খেতে

বসে আমরা সবাই বরাবর বাঁ হাতে জল খেয়েছি। বাবা শুয়োর, গোরুর মাংস খেতেন, হুইস্কি-টুইস্কি তো ছিলই। আমরা এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের আদি বনেদি বাড়ি। সেইখানে জন্মে আমরা বড় হয়েছি। কোনও দিন অভাব টের পাইনি। যদিও আমাদের বংশগৌরব আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু আমাদের অসুবিধে ছিল না। বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অনেক টাকা সাধু ও অসাধু উপায়ে আয় করতেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ মানতেন না।

আমাদের পুরনো বাড়িটার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'বার্ডস হাউস'। প্রকাণ্ড এজমালি বাড়িটায় যে আমাদের কত দূর ও নিকট সম্পর্কের শরিকেরা বাস করতেন তার আদমসুমারি হয়নি। শরিকের ঝগড়া তো ছিলই। কার ভেজা কাপড় কার গায়ে লাগল, কে তার সামনের বারান্দায় টিন দিয়ে ঘিরে নতুন ঘর তুলবার চেষ্টা করছে, কে তার ভাগের জায়গায় বাচ্চাকে হিসি করিয়েছে—এইসব সমস্যা অহরহ সকলের মাথা গরম রাখত।

শোনা যায়, আমার বাবা যৌবন বয়সে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু গোটা ধর্মের প্রতি তাঁর এমন বিরাগ ছিল যে শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট-ভজনাও তাঁর হয়ে ওঠেনি। আমাদের সেই বিশাল এজমালি বাড়িতে আমরা মোটামুটি একঘরে হয়েই ছিলাম, অন্য সবাই আমাদের ম্লেচ্ছ বলে এড়িয়ে চলত।

আমার একুশ বছর বয়েসের সময় বিয়ে হয়। বিয়ে হল এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁরা শ্রীহট্ট জেলার লোক, চৈতন্যদেবের ভক্ত। আমার স্বামী যদিও খুব বড় চাকরি করতেন না, তবু তাঁদের পরিবারটা বেশ সচ্ছল ছিল। আমার স্বামী জয়দেব চক্রবর্তী স্মল স্কেল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রির অফিসার ছিলেন। ছোটখাটো চেহারা, বেজায় ভালমানুষ, তবে কখনও কখনও তাঁকে বদরাগি বলে মনে হত। স্বামী সম্পর্কে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছি, সেটা খুব ভাল লাগছে না। বরং বলি জয়দেব লোকটা ভালই ছিল। কিন্তু সে যতখানি সুপাত্র ছিল, তার চেয়ে বোধহয় তুলনামূলকভাবে আমি আরও ভাল পাত্রী ছিলাম। চেহারার জন্য আমার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। কিছুকাল লোরেটোতে পড়েছি। কিন্তু আমার চরিত্রের সুনাম ছিল না বলে সেই স্কুল ছাড়তে হয়। পরে আমি একটা সাদামাটা স্কুল থেকে পাশ করি। তা হলেও আমি গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারতাম, নাচে-গানে ছিলাম চমৎকার, অভিনয়ে সুনাম ছিল। সোজা কথায়, গৃহকর্ম করে জীবন কাটানোর জন্য আমি তৈরি হইনি। তেরো-চোদ্দো বছর বয়স থেকেই আমার নানারকম লঘু যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবং লোরেটোতে পড়বার সময়ে আমি যখন ক্রিক রোতে এক মাসির বাড়িতে থাকতাম তখনই আমার কয়েকবার সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। আর, এজন্য কখনওই আমার কোনও অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া হয়নি, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে ঢিলাঢালা নৈতিক পরিবেশে আমি মানুষ। আমার মা খুব উঁচু সমাজের মেয়ে, বাবাও উচ্চাভিলাষী এবং নৈতিক আদর্শবোধ থেকে মুক্ত ছিলেন। কাজেই আমরা শরীরকে শরীর ভাবতেই শিখেছি, তার সঙ্গে, মন বা বিবেককে মেশাইনি। এমনকী আমার যৌবনপ্রাপ্তির পর বাবাও অনেক সময়ে আমাকে ফচকেমি করে জিজ্ঞেস করেছেন—কী রে মেয়ে, কটা ছেলের বুকে ছুরি মেরেছিস? অর্থাৎ আমরা খুবই উদার পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার বড় দাদা, বাবা এবং মার সামনেই সিগারেট খেত। সে কিছু রোগা ছিল বলে বাবা প্রায়ই তাকে বলত—তুই মাঝে মাঝে বিয়ার খাস, তাতে শরীরটা অনেক ফিট থাকবে। উত্তরে আমার দাদা অভিজিৎ বলত—দূর, বিয়ার আমার পোষায় না, আমার প্রিয় ড্রিংক হচ্ছে হুইস্কি।

আমি সুন্দরী ছিলাম, নইলে ওই গোঁড়া পরিবারে আমার বিয়ে হত না। কিন্তু বিয়েটা যে কেন হয়েছিল সেটা আমি আজও ভেবে পাই না। প্রথম কথা, ওর চেয়ে ঢের ভাল বিয়ে হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, আমাদের দুই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির এত পার্থক্য যে বিয়ের প্রস্তাবই উঠতে পারে না। তবু হয়েছিল। একদিন কলকাতা থেকে বোধহয় কিছু মার্কেটিং করে দাদার সঙ্গে লোকাল ট্রেনে ফিরছিলাম, তখন বেলা এগারোটা হবে। ট্রেন ফাঁকা, আর একটা ফাঁকা কামরায় জয়দেবের বাড়ির লোকজন—মা, পিসি, জ্যাঠা গোছের সবাই যাচ্ছে তারকেশ্বরে। আমি তাদের পাশেই বসেছিলাম। বিধবা পিসি আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—আহা মা, বড় সুন্দর দেখতে গো তুমি! কোথায় থাকো বাছা?

এইভাবে পরিচয়। তারপর বলতে কী, তাদের বাড়ি থেকেই লোকজন এসে খোঁজখবর করল,

বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভাংচি দেওয়ার লোকও ছিল এজমালি বাড়ির শরিকদের মধ্যে। তারা গিয়ে পাত্রপক্ষকে গোপনে জানিয়ে এল যে বাবা খ্রিস্টান, আচার-বিচার মানে না, আমাদের চরিত্র খারাপ। কিন্তু তাতে আটকাল না। আমাকে তাদের বড় বেশি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা ভেঙে গেলে অবশ্য ভালই হত। আমার মায়ের অনিচ্ছা ছিল, শুনেছি জয়েদেবের বাবারও আপত্তি ছিল। জয়েদেবের বাবা গুজবগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর বোন, অর্থাৎ জয়দেবের পিসিই তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। অন্য দিকে আমার বাবা হঠাৎ তাঁর হিসেবি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, যে নীতিহীনতা ও অনাদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে মানুষ করেছেন সেগুলি মেয়ের বিয়ের সময়ে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষত, আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই। তাই বাবা হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধভাবে আমাকে বিয়েতে রাজি করালেন, দীর্ঘ আলোচনার পর। মায়েরও মত হল। এবং সে সময়েই মা আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন যে আমি সত্যিকারের কুমারী আছি কি না। তাঁর কোনও কারণে সন্দেহ হয়ে থাকবে। আমি অবশ্য স্পষ্ট জবাব দিইনি। কিন্তু মায়েরা তো বোঝে।

জয়দেবকে আমি খুব নিরাসক্তভাবে বিয়ে করি। পাত্র আমার পছন্দ ছিল না। ছোটখাটো চেহারার পুরুষ এমনিতেই আমি দেখতে পারি না, তার ওপর তার আবার নানারকম নৈতিক গোঁড়ামি ছিল। সেগুলো আরও অসহ্য। যেমন, বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যে সে শারীরিক দিক দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি। যেদিন হল, সেদিন মিলনের আগে সে আমার কুমারীত্ব পরীক্ষার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য কীভাবে পরীক্ষাটা করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি তখন, পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু এটা কোন মেয়ে আজকাল সহ্য করবে?

পরীক্ষা করে অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি কুমারী নই। আর আমিও তার বাতিক দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে এ লোকটা স্বামী হওয়ার উপযুক্তই নয়। কী করে যে ও আমার সঙ্গে, আমি ওর সঙ্গে ঘর করব সেটা বিয়ের পরেই আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বশুরবাড়িতে আমার নতুন নামকরণ হল, লতিকা। এটা ওদের বাড়ির নিয়ম, নতুন বউ এলে ওরা তার নাম পালটে নতুন নাম রাখে। এতে আমাদের আপত্তি ছিল। হুট বলতে কেন যে কেউ আমার জন্মাবধি নিজস্ব নামটা বাতিল করে দেবে! আমি যে নিজেকে বরাবর অলকা বলে জানি। অচেনা লতিকা আমি হতে যাব কোন দুঃখে? আমি খুব লাজুক মেয়ে নই, ভিতুও নই, তাই শ্বশুরবাড়ির নিয়মকানুনগুলোর বিরুদ্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম। এটা ওরা ভাল চোখে দেখেনি। জয়দেবকে নাম বদলানোর ব্যাপারটা বলতেই ও খুব বিরস মুখে বলল—তোমার নামধাম বদলে ফেলাই ভাল।

—কেন? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম।

—তোমার অতীতটা খুব ভাল নয় তো, তাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আমার অতীত কি খারাপ?

—খুব।

—কী করে বুঝলে?

জয়দেব তার বোকা এবং ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বলল—যারা বোঝে তারা ঠিক বোঝে।

আমি কী বলব ওকে, কী বললে ওর চূড়ান্ত অপমান হয় তাই ভাবছিলাম। ও আমাকে বলল—কেন, তুমি কি জানো না?

—কী জানার কথা বলছ?

—তুমি যে খারাপ?

সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো আমার হুট করে চোখের জল আসে না। বরং সে সব পরিস্থিতিতে আমার একরকমের পুরুষের রাগের মতো রাগ হয়, থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করে।

অবশ্য জয়দেবকে আমি থাপ্পড় কষাইনি, শুধু বলেছি—না, আমি খারাপ বলে নিজেকে জানি না। বরং মানুষকে যারা সাদা মনে গ্রহণ করতে পারে না তাদেরই খারাপ বলে জানি।

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বলল—মানুষকে সাদা মনে গ্রহণ করব! কেন?

—কেন করবে না?

—কেন করব? মানুষ নিজের সম্পর্কে যা বলে তা কি সব সময় সত্যি হয়?

—না-ই হল। ভালমন্দ মিশিয়েই মানুষ, মানুষ হওয়াটাই তার যোগ্যতা।

জয়দেব একটু হাসল। কিন্তু সে ঠিক হাসি নয়। বরং হাসির মুখোশে ঢাকা নিষ্ঠুরতা।

সে বলল—এই যে তুমি, তোমার কথাই যদি ধরা যায়, নিজের সম্পর্কে বলছ যে তুমি খারাপ নও। কিন্তু তোমার শরীর বলছে যে তা নয়।

—আমার শরীর কী বলেছে তোমার কানে কানে?

—বলেছে যে বিয়ের সময় তুমি কুমারী ছিলে না।

বললাম—গাধার মতো কথা বোলো না, তোমার মতো সন্দেহবাতিক যাদের তারা বিয়ে করে কোন মুখে?

জয়দেব মুখ কঠিন করে বলে—যাদের বাতিক নেই তারাই বোকা, যারা মানুষকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে তারাই অবিবেচক।

—তুমি কী করে বুঝলে যে আমি কুমারী ছিলাম না! তুমি কি ডাক্তার না হঠযোগী?

জয়দেব বলে—ডাক্তার বা হঠযোগী হওয়ার দরকার হয় না। একটু সন্ধিৎসু হলেই চলে, আর একটু বুদ্ধিমান হলেই হয়। কেন, তুমি কি অস্বীকার করতে চাও?

—নিশ্চয়ই। তুমি পিশাচের মতো কথা বলছ।

—না। শোনো, শরীর পরীক্ষা করে সবই বোঝা যায়। তুমি হয়তো জানো না, আমি জানি।

—তুমি ছাই জানো। তুমি পাগল, তোমার বাড়িসুদ্ধ পাগল। আমার খুব ভুল বিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারছি।

জয়দেব রেগে গেল না। খুব রাগি মানুষ জয়দেব ছিল না। ওর রাগ খুব ঠাণ্ডা আর দৃঢ়।

ও বলল—বিয়ে যে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ কী। পিসিমার জন্যই হল। কিন্তু হয়ে যখন গেছেই তখন যতদূর সাকসেসফুল করা যায় সেটা দেখাই আমার লক্ষ্য।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না, সন্দেহ দিয়ে শুরু হলে বিয়ে সাকসেসফুল হয় না। তার চেয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই ভাল।

জয়দেব এই প্রথম একটু ভয় পেল যেন, একটু চঞ্চল হয়ে বলল—এ তো সাহেব রাজত্ব নয় যে যখন-তখন বিয়ে ভাঙা যাবে!

—সে তোমরা বুঝবে না।

জয়দেব আমার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বলল—শোনো, সাহেবদের দেশে একটা মানুষের সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের বিয়ে হয়, বিয়েটা সেখানে ব্যক্তিগত ঘটনা, তার সঙ্গে পরিবার বা সমাজের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে তো তা নয়।

—তত্ত্বকথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি যদি অত বড় অপমানটা আমাকে না করতে তাও না হয় হত। আমি ও সব বুঝি না, বুঝবও না।

—তোমাকে একটু বুঝতেই হবে যে। বলতে গিয়ে জয়দেবের স্বর যথেষ্ট নরম হয়ে এল। তার মুখচোখে ভিতু-ভাবও একটু ফুটে উঠল কি?

আমি শুনতে চাইছিলাম না। উঠে চলে আসছি, জয়দেব তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে ফেলল। ঝনাৎ করে নতুন চুড়ি-শাঁখায় ভরা হাতটা শব্দ করে উঠল। আমি হাত টেনে বললাম—ছেড়ে দাও।

সেও হাত ধরে রেখে বলল—একটু শোনো, দুটো কথা...

ও ছোটখাটো মানুষ, আমার হাত ধরে আটকে রাখার মতো যথেষ্ট গায়ের জোরই ওর নেই। নেচে কুঁদে বরং আমার হয়েই সেই আধা-পুরুষটা দুহাতে আমার কোমর জাপটে ঝুলে পড়ল, বলল—যেয়ো না। শুনে যাও।

ওর পা থেকে কোমর অবধি মেঝেয় লুটোচ্ছে, উর্ধ্ব অঙ্গ ঝুলছে আমার কোমর ধরে, হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু আমার হাসি পায়নি। ওর ওই সর্বস্ব দিয়ে ঝুলে থাকা টানে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে আমি ওর মুখে থাবড়া দিলাম কয়েকটা। ও তবু ছাড়ল না। আমি টাল সামলাতে না পেরে থপ করে

বসে পড়লাম মেঝেতে। দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল, তখন ছুটির দিনের দুপুরবেলায় বাড়ির বেশির ভাগ লোকই ঘুমোচ্ছে, তবু কথাবার্তা শুনে কেউ কৌতূহলী হতে পারে তো! বিশেষ করে জয়দেব এ সব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল। দিনের বেলায় সকলের সামনে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলত না। বিয়ের একমাসের মধ্যেও দুপুরবেলা কখনও শারীরিকভাবে মিলিত হয়নি। সে নাকি শাস্ত্রে বারণ আছে। অসহ্য! অবশ্য মিলিত হয়েও সে যে আমাকে সুখী করতে পারত এমন নয়।

যাই হোক, দুজনে এক অস্বাভাবিক কুস্তির প্যাঁচ কষে যখন বসে বা শুয়ে আছি তখন জয়দেব আমাকে এইভাবে ধরে থেকে বলল—রাগ করে বুদ্ধি হারিয়ো না। বিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা সামাজিক কর্তব্য হিসেবে মনে করি, তাতে দুই পরিবারের মান-মর্যাদাও জড়িত। তাই বলি হঠাৎ ডিভোর্সের কথা চিন্তা করে সব ভণ্ডুল কোরো না।

—আমাকে চিন্তা করতেই হবে। আর চিন্তাই-বা কী, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

জয়দেব কোমর ধরে পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে সে হঠাৎ আমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বলল—তাতে তোমার-আমার কারও সম্মান বাড়বে না। লোকে ছি ছি করবে।

সেই মুহূর্তে জয়দেবকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। লোকটার কিছু দুর্জয় কুসংস্কার আর লোকলজ্জা আছে, যার জন্য ও আমার সব কলঙ্ককেও হজম করে যাবে। এটা বুঝে আমি আর একটু চাপ সৃষ্টি করার জন্য বললাম—তা হলে বলো, কী করে বুঝলে যে আমি কুমারী নই।

জয়দেব ভীত চোখে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থেকেই হঠাৎ চোখ বুজে বলল—আমার ভুল হতে পারে অলকা।

—তার মানে?

—তার মানে কুমারীত্ব পরীক্ষার কোনও নিশ্চিত উপায় নেই।

—তবে বললে কেন?

—দেখলাম, তুমি স্বীকার করো কি না।

আমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের জন্মগত কিছু বুদ্ধি তো থাকেই। এই বোকাটা কী করে ভাবল যে আমি স্বীকার করব? আমি বললাম—কী স্বীকার করব?

জয়দেব হঠাৎ খুব বদলে গিয়ে বলল—আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে নেই, সেই ক্ষমা প্রার্থনার কারণটা ছিল প্রবল কামেচ্ছা। হঠাৎ ওই রাগারাগি থেকে শারীরিক টানাটানির ফলে পরস্পরের নৈকট্য, ঘন শ্বাস, দেহগন্ধ, স্পর্শবিদ্যুৎ—সব মিলেমিশে এক প্রবল চুম্বকের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল। দেহ-অভিজ্ঞতা তো তখনও আমাদের নতুন, তাই সামলাতে পারল না জয়দেব। ঝগড়াটা শরীরের মিলন দিয়ে শেষ হল।

আবার হলও না।

প্রভাসরঞ্জন

সুইস এয়ারের যে উড়োজাহাজে আমি ফিরছিলাম তাতে খুব একটা ভিড় ছিল না। জানালার ধারে এক জার্মান বুড়ি, তার পাশে এক বুড়ো, পরের সিটটায় আমি। বুড়োর হাতে আর্থারাইটিসের ব্যথা, তাই বুড়ি বুড়োকে কফি কাপ ধরে ধরে খাইয়ে দিচ্ছিল, খাবার মুখে তুলে দিচ্ছিল। বুড়োর মুখে বোধহয় প্যারালাইসিসের ছোঁয়া আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুপ গড়িয়ে পড়ে, মাংসের টুকরো হঠাৎ করে কোলের ওপর পড়ে যায়। ন্যাপকিন তুলে বুড়ি বারবার মুখ মুছিয়ে দেয়, আর আমার দিকে অপ্রতিভ হাসি হেসে চেয়ে কেবলই ক্ষমা চায়। বুড়োর কাঠামোটা বিশাল, এক সময়ে যৌবনকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত বোধহয়। এখন বয়সে বড় জব্দ। কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, খুব জোরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়ে। অনবরত সেই শব্দে প্রেশারাইজড আবহাওয়ার উড়োজাহাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমি জেগে উঠি। বিরক্ত হই। বুড়ো আমার দিকে একটু একটু অপরাধবোধ নিয়ে তাকায়। বুড়ো-বুড়িকে আমার খারাপ লাগছিল না। বেশ ভালবাসা দুজনের। আমার জার্মান বউ সিসি আমাকে

খুব ভালবাসত, যদি বিয়েটা টিকত আর আমরা এরকম বুড়ো হতাম, তবে কি তখনও আমার জন্য এতটা করত সে?

সিসির কথা একটু একটু ভাবছিলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জার্মান মেয়েদের মতো গায়েগতরে বিশাল ছিল না, বেশ একটু নরম-সরম ছোট মাপের চেহারা। রোগাটে, সাদাটে, ভাবালু। খুব ভুলো মন ছিল তার। সেইসব দেখে আমি ঝপাং করে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সে তো পড়লই, যৌবনকালে ওরা বড় বেশি প্রেমে পড়ে। পরিচয়ের পর প্রেম হওয়ারও আগে আমরা এক বিছানায় বিস্তর শুয়েছি। যাকে ফুর্তিবাজ বলে আমি ঠিক তা নই। বিদেশে মেয়েদের গা-দেখানো এবং গায়ে পড়ার প্রবণতা এত বেশি ছিল যে সেখানে তাদের জলের মতো ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমারও এরকম অভিজ্ঞতা কিছু ঘটেছিল। সিসি তাদের মধ্যেই একজন। একসঙ্গে কিছুদিন থাকার জন্য ভূমিকা-টুমিকা করতে হয়নি। এবং কিছুকাল থেকে সরে পড়াতেও বাধা ছিল না। ফ্রাঙ্কফুর্টে আমার পনেরো দিনের ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার আগের দিন অবধি আমি সিসির একঘরের ছোট্ট বাসায় ছিলাম। থাকার খরচটা আমার বেঁচে যাচ্ছিল। ওকে আমার পছন্দও হচ্ছিল খুব। আসার দিন সকালে ঘুম থেকে ভাল করে ওঠার আগেই বিছানাতেই ওকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিই। ও খুব হেসে বলল—ঠিক এরকম ভঙ্গিতে আর কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমি জানি না। সিসি কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে ভীষণ খুশি। ওর জীবনে সেটাই প্রথম প্রস্তাব। সেই দিনই রেজিস্ট্রি করে আমি ব্যলে চলে আসি। দেড় মাস পর সিসিও এল, আমরা দুজনে বেশ একটু কষ্ট করে থাকতাম। কারণ, ও এসে প্রথম প্রথম চাকরি পায়নি। তার ওপর গর্ভবতী। চাকরি পেলেও করতে পারত না। ও তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, সঙ্গে আনুষঙ্গিক নানা অসুস্থতা। আমার বেতন খুব বেশি ছিল না, সিসির চিকিৎসা আর যত্নের জন্য পুরো টাকাটা বেরিয়ে যেত। মাস চারেক পর একটু সুস্থ হয়ে সে ফিরে গেল ফ্রাঙ্কফুর্টে, আবার কদিন পর এল। আমিও যেতাম। ব্যলেই অবশেষে সে চাকরি পায় আমার কোম্পানিতেই। যথাসময়ে আমাদের এক পুত্রসন্তান হয়। তার গায়ের রংটা আমার রং ঘেঁষা বটে, কিন্তু দুরন্ত ইউরোপীয় রক্ত শরীরে বইছে, বিশাল ছেলেটা জন্মেই জার্মানদের মতো গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

ছেলেটা যখন মাস চার-পাঁচেকের হল তখন সে আমার অতি আদরের ধন। বড়সড় চেহারা, কান্নাকাটি নেই, আমার কোলে উঠলে খুব চেঁচাত আনন্দে। অবিকল কাকাতুয়ার মতো শব্দ করত সে উত্তেজনার সময়ে। টিভি দেখতে খুব পছন্দ করত, কী কারণে জানি না লাইটার বা দেশলাই জ্বাললে খুব ভয় পেত। এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলেই কাঁদো-কাঁদো মুখ হয়ে যেত। তার চার মাস বয়সে রং অনেক ময়লা হয়ে গেল, দাঁত উঠবার সময়ে বেশ রোগাও হয়ে গেল সে। তার প্রিয় খাবার ছিল মিষ্টি, চকোলেট বা ক্যান্ডি পেলে মুখের লাল দিয়ে মাখামাখি করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চুষতে ভালবাসত। সে বেশ বড়সড় বাচ্চা ছিল, তবু তাকে দেখলেই বোঝা যেত যে সে ভারতীয় সন্তান, মুখে সিসির আদল থাকা সত্ত্বেও।

তার যখন পাঁচ মাস বয়স তখনই সিসি আর আমি আলাদা হওয়ার মনস্থ করি। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল মর্মান্তিক, বাচ্চাটাকে ছেড়ে কী করে থাকব! সিসিও জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং ভিন্ন জীবনের জন্য খুবই উদগ্রীব। আমার মতো নিস্পৃহ এবং কম আমুদে লোককে সে সহ্য করতে পারত না। যেমন আমি পারতাম না তার অতি উচ্ছল ও খানিকটা নীতিবিগর্হিত চলাফেরা। আমার ভিতরে এক তেমাথাওলা ভারতীয় গেঁয়ো বুড়োর বাস। সে কেবলই সতী-অসতী, ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতি বিচার করে যায়। কতবার তার মুখে হাতচাপা দিতে গেছি, থামাতে পারিনি। অশান্তির শুরু সেখানেই! একসময়ে আমার এও মনে হয়েছিল, সিসি চলে গেলেই বাঁচি, দেশে ফিরে একজন বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে সুখে থাকব।

কিন্তু ছেলেটাই মস্ত বাধা।

আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, আগেই বলেছি। সেটাও এই বিচ্ছেদের আর একটা কারণ। উপরন্তু সিসির বাবা মা বার্লিন থেকে তাকে ক্রমাগত চিঠি দিচ্ছিল ফিরে যাওয়ার জন্য। সিসি একটা মস্ত ভুল করেছে, তাদের ধারণা। সব মিলিয়ে একটা ঘোঁট পাকাল।

তারপর বিচ্ছেদ। ছেলের নাম রেখেছিলাম নীলাদ্রি। পরে সেই নাম সিসি বদলে দিয়েছিল কি না

জানি না। নীলুর জন্য আজও আমার মন বড় কেমন করে।

নীলু তার মার সঙ্গে জার্মানি ফিরে গেছে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না! দেখলে চিনবেও না তেমন করে। এতকাল ইউরোপে তবু তার কাছাকাছি ছিলাম। উড়োজাহাজ যখন উড়িয়ে আনছিল আমাকে পুবের দিকে তখন কেবল মনে হচ্ছিল, নীলুর কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছি।

পাশের বুড়োটা আমার হাঁটুতে হাত রাখল হঠাৎ। তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠি। তাকাতেই বুড়ো নাকের বাঁশি বাজিয়ে জড়ানো গলায় কী যেন বলে। আমি অস্পষ্ট শুনতে পাই—হাইজ্যাক!

ততক্ষণে বুড়িও সটান উঠে বসেছে। বুড়িও বলল—হাইজ্যাকারস—।

আন্তর্জাতিক বিমানে আজকাল সবসময়েই হাইজ্যাকের ভয়। বিমানের দুর্ঘটনার ভয়ের চেয়ে এই ভয় কিছুমাত্র কম নয়। কোথায় কোন গেরিলা বা লিবারেশন আন্দোলনের বিপ্লবী পিস্তল-বোমা নিয়ে উঠে বসে আছে কে জানে! মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় সর্বত্রই গভীর অসন্তোষ। দেশপ্রেমিক বা ভাড়াটে গেরিলা সর্বত্রই বিরাজ করছে। কখন কোন বিমানকে ভয় দেখিয়ে তারা অজানা ঠিকানায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ হিসেবে কতজনকে আটকে রাখে বা হত্যা করে তার কোনও ঠিক নেই। তাই আজকাল আন্তর্জাতিক বিমানে উঠলে অনেকেরই বুক একটু ধুকপুক করে।

তাই বুড়ো-বুড়ির চাপা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে সামনের তিন সারি দূরত্বে একজন আরবকে দেখতে পাই। অবশ্য সে আরব কি না তা বলা খুবই মুশকিল, তবে সে যে মধ্যপ্রাচ্যের লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাল ও থুতনি জুড়ে চাপা দাড়ি। চমৎকার মোটা গোঁফ। বাচ্চা একটা হাতির মতো তার বিশাল চেহারা। তাকে কয়েকবারই টয়লেটের দিকে যেতে দেখেছি উড়োজাহাজে ওঠার পর থেকে। পেটের রোগ, বহুমূত্র বা বাতিক না থাকলে অতবার কেউ বাথরুমে যায় না। কিন্তু তখন তাকে সন্দেহ হয়নি। এখন দেখি, কাঁধে একটা এয়ার ব্যাগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে এক দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে এয়ার ব্যাগটা ঝুলছে ব্যাগের চেন খোলা, তার বাঁ হাতটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো। খুবই সম্ভব, সে ব্যাগের মধ্যে গুপ্ত গ্রেনেড বা পিস্তল ছুঁয়ে আছে, এবং পিছনের দিকে তার কোনও সহ-গেরিলার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে—সব প্রস্তুত কি না।

একটু আগেই নীলুর কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছিল। ছেলেকে ইউরোপে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, আমার পরিচয় তার জীবন থেকে মুছে যাবে, আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে যাব পরস্পরের কাছে। অথচ সে আমারই বীজ, আমার শরীর থেকে তার অস্তিত্বের জন্ম। এতখানি আমাদের আত্মিক সম্পর্ক, তবু সে আজ আমার কেউ না। খুবই শিশু অবস্থায় সে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, সেই বয়স পর্যন্ত তার হাবভাব, হাসা-কাঁদা, অবোধ শব্দ সবই আমার ভিতরে টেপ রেকর্ড করা আছে। স্মৃতির বোতাম টিপে দিলেই টেপ রেকর্ড বাজতে থাকে। সবই মনে পড়ে। আমার মাথার ভিতর থেকে একটা প্রোজেকটার মেশিন চোখের পর্দার ওপরে তার সব চলচ্চিত্র ফেলতে থাকে। ছেলেটাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, অধিকারবোধ ছাড়তে চায় না। নীলু আমার ছেলে—এই বাক্যটা ধ্রুবপদের মতো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা অসহায় ভালবাসা বাৎসল্য আমাকে খুবই উত্তেজিত এবং অবসন্ন করে দেয়। দেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেও আমার জন্য কোল পেতে কেউ বসে নেই। আদরে আহ্লাদে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। ছেলেবেলা থেকে আমাদের পরিবারে ভালবাসার চাষ কম দেখেছি। দুঃখে দারিদ্র্যে হতাশায় আধমরা মানুষ ছিলাম আমরা, পেটের ভাতই ছিল তখন ভালবাসার চরম নিদর্শন।

বাবা-মা বুড়ো হয়েছেন। সংসার প্রায় অচল। প্রথম প্রথম আমি টাকা পাঠিয়েছি। বিয়ে করার পর তাও পাঠাতে পারিনি। কীভাবে সংসার চলে তা আমার জানা নেই, জানতেও চাইনি। ও সব জানতে গেলে মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই না জানারই চেষ্টা করেছি। বাবার চিঠিতে যে অংশ সংসারের দুঃখের বিবরণ থাকত সেই অংশ আমি বাদ দিয়ে পড়তাম। জানতাম, তাদের জন্য আমার আর কিছু করার নেই, খামোকা তবে তাদের দুঃখের কথা জেনে কী হবে।

এরোপ্লেনে বসে আমি সারাক্ষণ আমার দুটো জীবনের কথা ভাবছিলাম। স্বদেশে আমার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, বিদেশে আমার নানা আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা। এর ওপর নীলুর স্মৃতি। বিদেশিদের

মধ্যে এত বেশি সন্তানস্নেহ বোধহয় নেই। অন্তত আমার মতো পিপাসার্ত পিতৃহৃদয় আমি কারও দেখিনি। নিজের বাপ মায়ের মধ্যেও পুত্রস্নেহের কোনও বাহুল্য প্রকাশ পেত না। তা হলে আমার এই প্রবল স্নেহ এল কোত্থেকে?

পরে আমি অনেক ভেবে এর একটা উত্তর খুঁজে পাই। আসলে স্বদেশে যারা আমার আপনজন তাদের কোনওদিনই আপন বলে মনে হয়নি। একমাত্র ছোটকাকাকে মনে হত। কেন মনে হত তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কিন্তু যেই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে শুরু করি সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বিদেশেও তাই। আমার ছেলেটিকে বুকে চেপে যখনই ভাবতে শুরু করি এই আমার নিজস্ব সন্তান, তখনই তার ছেড়ে যাওয়ার সময় হল।

আশ্চর্য এই, নীলাদ্রির মুখে আমার ছোটকাকার মুখের ছাপ ছিল। এও হতে পারে, স্নেহের দুর্বলতা থেকেই আমি তার মুখে কাকার আদল দেখতাম। পৃথিবীতে আমার প্রিয় জনের সংখ্যা খুব কম। বাবা-মার প্রতি আমার দুর্বলতা বা শ্রদ্ধা খুব বেশি থাকার কথা নয়। শিশুকাল থেকে অভাব, আর সংসারের ভার কাঁধে বয়ে তাঁদের ওপর আমার বীতশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল। মনে হত, আমার কোমরে শেকল দিয়ে সংসারটা কে যেন বেঁধে দিয়েছে, যার জন্য আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, অনার্স ছাড়তে হয়েছিল, জীবনের অনেক সার্থকতা আমাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আমার এক বিরূপ মনোভাবের জন্ম হয়। যখন বিদেশে সিসিকে বিয়ে করলাম তখন সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল, এই বুঝি ভালবাসার আশ্রয় পেলাম। ভুল, খুবই ভুল সেটা। সে ভালবাসার শুরু দেহের প্রেম দিয়ে তার বিয়ে কতদূর নিয়ে যেতে পারে আমাদের। শরীর জুড়োল তো ভালবাসা ফুরোল! আমরা কেবল শরীর দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসার চেষ্টা করেছি। পরস্পরের সান্নিধ্য রাখা ছিল সামাজিক কর্তব্যের মতো। সেখানে বিশাল ও ব্যাপ্ত কর্মময় জীবনে সিসিও যেমন ব্যস্ত, আমিও তেমনই ব্যস্ত তাই আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরতা কমে গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কারবশত আমি তার স্বাধীন চলাফেরা বা বহির্মুখিনতা খুব বেশি পছন্দ করতে পারতাম না। তাই সিসি নয়, নীলুই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। তার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেত। তাই নীলু চলে গেলে সারা পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না।

না বিদেশে, না স্বদেশে, কোথাও আমার কেউ নেই—এরকম একটা বোধ আমার বুকে পাথরের মতো জমে আছে। বিদেশে থাকার আনন্দ নেই, স্বদেশে ফেরার আনন্দ নেই। আমার মতো এমন উদ্বাস্তু কে আছে কোথায়। এরকম মনের অবস্থায় মাঝে মাঝে আমার মরতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মরাটা জীবনে একবারই ঘটে, তাই সেই নিশ্চিত অভিজ্ঞতাটিকে আমি কিছু বিলম্বিত করছিলাম। দেখা যাক, মরবার আগে কোথাও কোনও ভালবাসা বা প্রিয়ত্বের আলো চিড়িক দেয় কি না। তারপর আমার হাতের মুঠোয় মৃত্যু তো আছেই। এরকম মানসিকতা থেকে আমার মৃত্যুভয় কেটে গিয়েছিল। অন্তত কেটে গেছে বলেই ধারণা ছিল আমার।

আরব লোকটা যখন ওইরকম একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঘুরে তার সঙ্গীকে দেখছে আর আমার পাশের বুড়োটার একটা প্রকাণ্ড কাঁপা-কাঁপা ঘামে ভেজা হাত এসে আমার কবজি পাকড়ে ধরল, আর বাঁশির মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে যখন সে বারবার বলতে থাকল—'আইজ্যাক, 'আইজ্যাক', তখন অন্য অনেক যাত্রীও তন্দ্রা ভেঙে সচকিত হয়ে বসে পরিস্থিতি লক্ষ করছে। তাদের অনেকের মুখেই ভয়ের পাঁশুটে ভাব, তখনই আমিও হঠাৎ টের পেলাম, বাস্তবিক আমি আন্তরিকভাবে কোনওদিন মরতে চাইনি। মনে হল, জীবন কত সুন্দর ও বিশাল ছিল আমার। বয়স পড়ে আছে অঢেল। এখনও চেষ্টা করলে জীবনে কত কী করতে পারি।

আরব লোকটা তার প্রচণ্ড ঘন ভ্রূ দিয়ে ভ্রূকুটি করে 'আলিজা' কিংবা অনুরূপ একটা চাপা ধ্বনি করল। সম্ভবত কারও নাম। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। একটু আগেই ডিনার হয়ে গেছে, সেই অতি সুস্বাদু খাবারের স্বাদ এখনও জড়িয়ে আছে জিভে। সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তার রিমঝিম নেশা এখনও মাথায় রয়ে গেছে। সুন্দর একটা শারীরিক তৃপ্তির পর একটু আগে কফি শেষ করে সিগারেট খেয়েছি। সেইটাই কি জীবনের শেষ পানভোজন? কে জানে, কে বলবে?

ও পাশের বুড়িটা একটা ফোঁপানির শব্দ করল। সাহেব মেমরা কম কাঁদে। প্রকাশ্যে তো কখনওই

কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু বয়সের দোষে এবং ভয়বশত বুড়ি কাঁদছিল। কথা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম, তাদের ছেলেপুলে নেই, দুজনেরই আগে একবার করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরস্পরের এই বিয়েটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছে, মৃত্যুর আগে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—বলেছিল বুড়ি। বুড়োর গা একটা কম্বলে ভাল করে ঢেকে-ঢুকে দিচ্ছিল একটু আগে, তাতে আমিও সাহায্য করেছি। আমার জীবনে ভালবাসা নেই বলেই বোধহয় তাদের ওই ভালবাসা আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই তো এরা দুনিয়ার আর কারও পরোয়া করে না, পরস্পরকে নিয়ে কেমন মেতে আছে। প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুতেই তো এই পৃথিবী আর জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব নয়। জীবনের একেবারে শেষভাগেও এই দুই অথর্ব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বেঁচে থাকাকে একরকম করে উপভোগ করছে দেখে আমার একটু ঈর্ষা-মেশানো আনন্দ হচ্ছিল।

আরব লোকটা কাকে ডাকল কে জানে! কিন্তু পেছন থেকে কোনও উত্তর এল না। আরবটা তখন তার সিট থেকে বেরিয়ে মাঝখানের প্যাসেজটায় দাঁড়াল, তখনও ব্যাগের মধ্যে হাত। খুব সম্ভবত সেই লুকানো হাতটা গ্রেনেডের সেফটি ফিউজ আলগা করছে আস্তে আস্তে। প্যাসেজে দাঁড়াতেই তার বিশাল চেহারাটা আরও বিশাল নজরে পড়ল। তার বাহুর ঘের বোধহয় আমার বুকের সমান হবে। বুকটা মাঠের মতো ধু-ধু করা বিরাট। ইচ্ছে করলে ও বোধহয় ঘুষি মেরেই পলকা প্লেনটাকে তুবড়ে দিতে পারে। কিন্তু আপাতত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখে ভ্রূকুটি। ডান হাতটা খানিকটা মুঠো পাকিয়ে আছে। যাত্রীরা সবাই দৃশ্যটা দেখছে, কিন্তু কেউ নড়ছে না। কিন্তু অস্ফুট 'হাইজ্যাক' শব্দটা চারপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি। ফিসফাস শব্দ হচ্ছে। একটা বছর ছয়েকের বাচ্চা প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে, তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, পরিষ্কার ইটালিয়ান ভাষায় সে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে—মরে গেলে আমাদের কি রোমে ফিরতে দেরি হবে?

আমাদের দমদমের বাড়িতে একদিন একটা কাক ডানা ভেঙে পড়ে গিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়, আর তাকে ঘিরে সারাদিন হাজারটা কাক চেঁচামেচি করেছিল। আমার ছোট ভাই দৃশ্যটা খুব করুণ চোখে দেখেছিল। পর দিন যখন আবার এঁটো কাঁটা কাক খেতে এসে উঠোনে নামছে তখন সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কাককে দেখিয়ে বলল—দাদা, ওই কাকটা কাল মরে গিয়েছিল না রে?

সেই স্মৃতিটা মনে আসতেই এক ঘোর মায়ায় আমার বুক ভরে গেল। শিশুরা তো মৃত্যুকে জানে না! ওই মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমাকে যেন চাবুক মারল। নীলুর কথা মনে এল, ছোট ভাইটার কথা মনে এল। স্নেহমায়ায় বুক ভরে গেল। আর ওই তীব্র চেহারার আরব লোকটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আমার ভিতরে মৃত্যুভয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটাল যেন।

আরবটা এক পা, এক পা করে কয়েক পা এগিয়ে এল। দাঁড়াল। আবার এগোল। দাঁড়াল। সেই একই ভঙ্গিতে তার ডান হাত মুঠো পাকানো। বাঁ হাত ব্যাগের মধ্যে ভরা। একটু বাদেই কিছু একটা ঘটবে। লোকটার মুখে-চোখে এক কঠিন আত্মপ্রত্যয়। মৃত্যুর প্রতি সে নির্মমভাবে উদাসীন। সবরকম বিপদকে নিয়েই সে বেঁচে আছে।

আর তখন হঠাৎ আমার মানসিক একটা বিকলতা ঘটে গেল। হঠাৎ যেন এরোপ্লেনের মৃদু চাপা শব্দ, আর অতি ক্ষীণ থরথরানি থেমে গেল। আর আমি এক স্বপ্নময় দৃশ্যের মধ্যে ঢলে পড়লাম।

সেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত।

দেখি, একটা বিচিত্র দেশে আমি পৌঁছে গেছি। এখানে মাটির রং নীল, তার ওপর হলুদ সবুজ লাল গোলাপি, হরেক রকমের ঘন ঘাস গজিয়ে চারধারে যেন এক বিভিন্ন রঙের দাবার ছক তৈরি করে রেখেছে। এইসব রঙিন ঘাসের নিখুঁত চৌখুপির ধারে ধারে নাতিদীর্ঘ গাছে সম্পূর্ণ গোল রামধনু। ছবিতে যেমন সব কাল্পনিক পাখি দেখা যায়, তেমনই সব পাখি উড়ছে চারধারে। আকাশের রং উজ্জ্বল নীল, তাতে গোল গোল সুন্দর নানাবর্ণের মেঘ। তারাগুলো অনেক কাছে কাছে ফুটে আছে। আর প্রতিটি তারার মধ্যেই নাক মুখ চোখ আঁকা। আকাশের একধারে একধারে এত বড় একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় দিগন্তের প্রায় বারো আনা অংশ জুড়ে আছে। চারধারে ছোট ছোট টিলা রঙিন কাচ আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। রাস্তা দিয়ে পুতুলেরা হেঁটে যাচ্ছে। দুটো কুকুর অবিকল মানুষের ভাষায়

কথা বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। গ্রোসারি শপ-এর সামনে একটা টেকো পুতুল একটা পাখির সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। তিনজন পরী উড়ে উড়ে রামধনুগুলোয় আরও ভাল করে রং দিয়ে দিচ্ছে। একটা খেলনা মোটরগাড়ি মোরগের ডাকের মতো ভেঁপু বাজিয়ে চলে গেল। চারধারে কী এক অপরিসীম শান্তি, এক মৃত্যুহীন নিরাপদ শাশ্বত জগৎ!

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, নীলুর জন্য যে সব ছবির বই কিনে দিয়েছিলাম আমি, তারই কোনওটার মধ্যেই এই ছবিটা ছিল। আমি সেইরকমই একটা ছবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমি হঠাৎ ডুকরে বলে উঠলাম—নীলু!

আরব লোকটা সেই মুহূর্তেই আবার ডাকল—আলিজা!

এবার পিছন থেকে একটা শব্দ হল। তারপর একটা লম্বা, সুন্দরপানা মেয়ে উঠে এল কোথা থেকে। তারও অবিকল মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা। সে এসে এই বিশাল লোকটায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। এই মেয়েটাই কি ওর সহ-গেরিলা?

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অলকা

এই সকালবেলায় আমার ঘরখানা চমৎকার দেখাচ্ছে। সারা দিনের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের হল সকালবেলা। আমি খুব ভোরে উঠতে পারি না বলে আমার একরকম দুঃখ আছে। তবে মাঝে মাঝে বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঘরময় সকালের রোদ দেখি। কী সুন্দর লাগে ভোরের একটা আলাদা গন্ধ! লক্ষ করে দেখেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মানুষকে সবচেয়ে ভাল দেখায়।

পার্ক সার্কাসের এই ফ্ল্যাটটা প্রথমে ভাড়া করেছিল আমাদের এক মাসতুতো দাদা। আমার বিয়ের ছ মাস পর আমি আর জয়দেব হনিমুন করতে যাই শিলঙে। বুদ্ধিটা কার ছিল কে জানে। জয়দেবদের পরিবারে হনিমুনের চল ছিল না। কিন্তু আজকাল বাঙালি সমাজে হনিমুনের চল হয়েছে। আমার মনে হয় জয়দেবই আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য পরিবার থেকে কিছুদিন আমাকে নিয়ে আলাদা হতে চেয়েছিল। সেইটেই হল কাল।

শিলঙে আমরা একটি হোটেলের ঘরে দুটো ঝগড়াটে বেড়ালের মতো দিনরাত ফোঁসফোঁস করতাম। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না।

জয়দেব হয়তো বলল—এক গ্লাস জল দাও তো!

আমার প্রেস্টিজে লাগল, বললাম—গড়িয়ে খাও, নয়তো বেয়ারাকে বলো।

—তুমি তো আমার বউ, এটুকু করলে তো দোষ হয় না।

—বউ মানে তো ঝি নয়।

একদিন একটা মেয়েকে দেখে জয়দেব বলল—দেখ, মেয়েটি কী সুন্দর!

স্বামী কোনও যুবতীকে সুন্দর দেখলে স্ত্রীর একটু হিংসে হওয়ার কথা, আমার হল না। বললাম—বেশ সুন্দর!

—আলাপ করব?

—করো না! তবে তুমি তো তেমন স্মার্ট নও, ভাল করে ভেবে-চিন্তে কথা বলো।

জয়দেব অবশ্য গেল না কথা বলতে। চেরাপুঞ্জি দেখতে গিয়েও খুব তুচ্ছ কারণে একচোট ঝগড়া হল। জয়দেব বলল—চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় এটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি রিসেন্টলি একটা বিদেশি ম্যাগাজিনে পড়েছি আর একটা কোনও জায়গায় যেন এর চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়।

চেরাপুঞ্জিতে না হয়ে অন্য কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলেই-বা আমার ক্ষতি কী? কিন্তু যেহেতু জয়দেব বলছে, সেই হেতু আমার কথাটা ভাল লাগেনি, মনে হয়েছিল ও একটু পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করছে।

আমি বললাম—আন্দাজে বোলো না।

—না অলকা, আমি পড়েছি।

—মিথ্যে কথা। চেরাপুঞ্জিতেই বেশি বৃষ্টি হয়।

জয়দেব রেগে বলে—আমি বলছি আমি পড়েছি।

—পড়লেও ভুল পড়েছ। আমরা ছেলেবেলা থেকেই চেরাপুঞ্জিকে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির জায়গা বলে জানি।

—ভুল জানো।

—তুমি ভুল পড়েছ।

এইভাবেও আমাদের ঝগড়া হত।

শিলং বা চেরাপুঞ্জির দোষ নেই, ভূগোল বই বা বিদেশি ম্যাগাজিনও দায়ী নয়। আমরা দুজনেই টেলিফোনে দুটো রং নাম্বার পেয়ে অচেনা লোককে চেনা ঠাওরাবার অভিনয় করছি।

শিলং থেকে দুজনেই কিছু রোগা হয়ে ফিরে এলাম। শ্বশুরবাড়িতে কিছুকাল থেকে শরীর আরও খারাপ হল। লোকে ভাবল বোধহয় মা হতে চলেছি। ডাক্তার দেখে বলল—না, পেটে ফাংগাস হয়েছে।

শরীর সারাতে বাপের বাড়ি গেলাম। মাসখানেক পর জয়দেব নিতে এল। গেলাম না। জয়দেব তখন গ্রামে ঘুরে কটেজ আর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জন্য কী সব কাজ করে বেড়ায়। বাড়িতে খুব একটা থাকে না। শুনলাম, প্রাচীন মন্দিরের ওপর থিসিস লিখছে ডকটরেট করার জন্য। আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই না শুনে রাগ করে বলল—আমি কুড়ি দিন বাইরে বাইরে ঘুরে ফিরলাম, তুমি এ সময়ে যাবে না আমার কাছে?

আমি প্লেটে করে আচার খাচ্ছিলাম, জিভে টকাস টকাস শব্দ করে বললাম—আমাকে দিয়ে তোমার কী হবে? বউগিরি করতে আমার ভাল লাগে না।

জয়দেব আমার আচার খাওয়া দেখছিল। ওই সিরিয়াস অবস্থাতেও ওর মুখ রসস্থ হয়ে গিয়েছিল, মুখের ঝোল টেনে বলল—বউ গিরি কথাটা কি ভাল।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম—ভাল না মন্দ কে জানে! আমার তো তাই মনে হয়।

জয়দেব হাল না ছেড়ে বলল—তুমি কি আমাকে একটুও সহ্য করতে পারো না?

—পারতে পারি। যদি তুমি আলাদা থাকো।

—আলাদা থাকলে কী হবে?

—আমি আলাদা বাসায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। তোমাদের বাড়ির অত লোকের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তুমি আলাদা বাসা করে খবর দিয়ো। যাব।

—এই কি শেষ কথা?

—হ্যাঁ।

—আমার বাড়ির লোক তোমার কী ক্ষতি করেছে?

—তা জানি না। তবে যদি আমাকে চাও তো বাড়ি ছাড়তে হবে।

জয়দেব ভাবল। ফিরে গেল। মনে হল, কথাটা সে ভেবে দেখবে।

কিন্তু জয়দেবকে আমি তখনও ঠিক চিনতে পারিনি। বাড়ি ছাড়বার ছেলে জয়দেব ছিল না। কদিন পর তার একটা পরিষ্কার চিঠি এল। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে লিখে পাঠিয়েছে—অলকা, বিয়ে ভাঙার জন্য যা করতে হয় তা তুমি করতে পারো। আমি ইনিশিয়েটিভ নেব না। বিয়ে ভাঙা আমি পাপ বলে মনে করি। কিন্তু তুমি যদি চাও তো দাবি ছেড়ে দেব।

চিঠিটা পেয়ে যে খুব উল্লসিত হয়েছিলাম তা নয়। কোথায় যেন আমার মেয়ে-মানুষি অহঙ্কারে একটু ঘা লাগল। যত যাই হোক, একবার বিয়ে হয়ে গেলেই তো মেয়েরা আর কুমারী রইল না। এই বাংলাদেশে কুমারী যে নয়, সে একা হলে বড় মুশকিল।

এই চিঠি এলে আমাদের পরিবারেও হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাবা যত প্রগতিপন্থী হোন, মা যত আধুনিকা হোন, মেয়ে বিয়ে ভেঙে স্বামী ছেড়ে চলে আসবে, এটা তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে

পারেননি।

বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন—চল অলকা, আজই তোকে তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসি।

মাও বাবার সঙ্গে একমত। আমার ঠাকুমা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করলেন। দাদাও খুশি নয়।

অথচ আমি-ই বা কেন শ্বশুরবাড়ি যাব?

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া লাগল। আমি স্পষ্ট বললাম, যদি জয়দেব বাড়ি থেকে আলাদা হয় একমাত্র তবেই আমি ফিরে যেতে পারি।

বাড়ির লোকজন আমার মতে মত দিল না। জোর করতে লাগল। আমি প্রায় একবস্ত্রে মাসির বাড়ি চলে এলাম।

মাসিও বাঙালি হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমাকে চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিয়েছে একসময়ে। সব রকম আধুনিকতায় শিক্ষিত করেছে, তবু দেখা গেল আমার এই বিয়ে-ভাঙার ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না। বলল—দূর মুখপুড়ি, স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়াই করিস, বিয়ে ভাঙতে যাস না। এ দেশে যারা বিয়ে ভাঙে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়, হুট করে এই কম বয়সে ও সব করিস না।

মাসির সঙ্গেও বনল না। অথচ কেন জানি না মনটা বড্ড আড় হয়ে আছে, জয়দেব বা তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না।

আমার আর এক মাসির ছেলে অসীমদা তখন বিলেত যাচ্ছে। বউ-বাচ্চা নিয়েই চলে যাবে। পাঁচ-সাত বছর ফিরবে না। তার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ থাকবে এমন কথা হচ্ছিল। কলকাতায় বাসা পাওয়া প্রচণ্ড সমস্যা বলে তারা ফ্ল্যাটটা ছাড়তে চাইছিল না। তখন আমি অসীমদাকে বললাম—ফ্ল্যাটটায় আমাকে থাকতে দাও।

অসীমদা খুশি হয়ে বলল—তবে তো ভালই হল। কতগুলো দামি ফার্নিচার রয়েছে, তুই আর জয়দেব থাকলে ভালই হবে।

জয়দেব থাকবে না, আমি একা থাকব—এটা আর অসীমদার কাছে ভাঙলাম না।

ওরা যেদিন রওনা হয়ে গেল সেদিন বিকেলে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দখল করলাম। জীবনে এই প্রথম একা থাকা। একদম একা। একটু ভয়-ভয় করছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আনন্দও হচ্ছিল। একা আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কী যে আনন্দ!

বাড়ি থেকে মা বাবা আত্মীয়স্বজনরা এসে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক জ্বালাতন করল, আমি জেদবশত গেলাম না। বাড়িতে ফিরে গেলেই ক্রমাগত আমার ওপর নানাদিক থেকে চাপ সৃষ্টি হবে। অনেক ঠেস-দেওয়া বাঁকা কথা, অনেক চোরা-চাউনি আর মুচকি হাসি সইতে হবে। তার চেয়ে বেশ আছি। ফিরে গেলাম না বলে সকলেরই রাগ, মা তো মুখের ওপরে বলেই গেল—তুমি বদমাশ হয়ে গেছ। নষ্টামি করার জন্যেই একটা ফ্ল্যাটে একা থাকবার অত শখ।

ব্যাপারটা তা নয়। বিয়ের আগে যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষদের প্রতি আমার এক ধরনের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, কেন জানি না, জন্মেছে।

একা ফ্ল্যাটে থাকতে হলে চাকরি চাই। কলকাতায় চাকরির বাজার তো তেমন সুখের নয়। তবু চেষ্টা-চরিত্র করে এক চেনা সূত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক অধ্যাপকের বাড়িতে বাচ্চা রাখার কাজ পেলাম। ইংরিজিতে বলে বেবি সিটার। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে। স্ত্রী ডাক্তার। তারা মানুষ বেশ ভাল। বালিগঞ্জ প্লেসে তাদের বাড়িতে সকাল আটটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সাত আর তিন বছরের দুটো ছেলেমেয়েকে সামলে রাখতাম। দুপুরের খাবার দিত আর দুশো টাকা মাইনে। সাত বছরের ছেলেটা কনভেন্টে পড়তে যেত। তাই তাকে বেশি আগলাবার দরকার পড়ত না। তিন বছরের মেয়েটাকে সারাদিন ঘড়ি ধরে সাজাতাম, খাওয়াতাম, গল্প বলে ঘুম পাড়াতাম। বেশ লাগত। অসম্ভব মিষ্টি আর দুষ্টু মেয়েটা, সাতদিনেই সে আমার বড় বেশি ন্যাওটা হয়ে গেল। তার কচি মুখের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ দিত একটা কথা—আমার যদি এরকম একটা মেয়ে থাকত।

যে সব বাচ্চার মা চাকরি করে তাদের যে কী দুরবস্থা হয় তা এই দুটো বাচ্চাকে দেখেই বুঝতাম। দুজনেই কিছু অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, অভিমানী, আর নিষ্ঠুরও ছিল। প্রথমে গিয়েই আমি বাচ্চাদুটোর মধ্যে কেমন ভয়-মেশ্যানো সন্দেহ-মেশানো একরকমের দৃষ্টি দেখেছিলাম চোখে। সারাদিন

ওরা মায়ের জন্য অপেক্ষা করত মনে মনে। ডাক্তার মায়ের ফিরতে রাত হত। তখন মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েও জেগে জেগে 'মা' বলে ডেকে ফের ঘুমোত। অন্য কোনও বাচ্চা দেখলেই মেয়েটা তাকে গিয়ে মারত, খিমচে দিত, চোখে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করত। সব সময়ে সে যেন তার প্রতি এক অজানা অন্যায়ের শোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। বড় কষ্ট হত আমার।

মাস তিনেকের মধ্যেই আমি বাচ্চা দুটোর আসল মা হয়ে উঠলাম। সারাদিন আমি তাদের নিয়ে থাকি। আমার নিজের ছেলেমেয়ে হলে তাদের নিয়ে কী করতাম সেই ভেবে মায়ের মতো সব হাবভাব করি, বায়না রাখি, শাসন করি। ওরা তাই আমার মধ্যে হারানো মা কিংবা নতুন মা খুঁজে পেল। নিজেদের মার জন্য খুব বেশি অস্থির হত না। বরং আমি সন্ধেবেলা চলে আসবার জন্য তৈরি হলে মেয়েটা ভয়ংকর কান্নাকাটি করত। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে আসা মুশকিল হয়ে উঠল। এইভাবেই জড়িয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু বাচ্চাদের বাবা রোহিতাশ্ব চৌধুরী একদিন আমাকে বললেন—অলকা, আপনি তো খুবই শিক্ষিতা এবং ভদ্রঘরের মেয়ে, এ কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। যদি বলেন তো আপনার জন্য একটা ভদ্রগোছের চাকরি দেখি।

তাই হল। এ কথার মাস দুয়েকের মধ্যে আমি একটা বাঙালি বড় ফার্মে টাইপিস্ট-ক্লার্কের চাকরি পেলাম। বাচ্চাদের জন্য মনটা খুব ফাঁকা লাগত। ওরা আর একজন বেবি সিটার রেখেছে জেনে মনটাও খারাপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি ওদের, এটা-সেটা কিনে দিই। কিন্তু মাতৃত্বের এক অসম্ভব ক্ষুধা বুকের মধ্যে কেবলই ছটফট করে।

জয়দেবের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের কোনও সক্রিয় চেষ্টা আমি করিনি। সে বড় হাঙ্গামা। উকিলের কাছে যাও, সাক্ষী জোগাড় করো। তা ছাড়া আমার অভিযোগ-বা কী হবে জয়দেবের বিরুদ্ধে? তাই ও সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আলাদা আছি বেশ চলে যাচ্ছে, আর কেন মামলার হাঙ্গামায় যাওয়া? জয়দেব তো আমাকে চিমটি দিচ্ছে না!

যুবতী মেয়ে। একা থাকি। আমার কি কোনও বিপদ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। অসীমদার ফ্ল্যাটে একটা ফোন ছিল, তাতে কিছুদিন একটি ভিতু ছোকরা আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করার চেষ্টা করে। আমি ফোন তুলেই গলা চিনেই ফোন ছেড়ে দিতাম। তিন মাস পর সে হাল ছেড়ে দেয়। ওপরতলার এক মহিলার ফ্ল্যাটে মদ আর জুয়ার আড্ডা বসত। একবার সেখানকার এক মাতাল আমার ঘরের কড়া নেড়েছিল, আমি দরজা খুললে সে আমাকে ধরবারও চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা মাতলামি। পরে সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল।

এরকম দু-একটি ছোটখাটো ঘটনা বাদ দিলে আমার জীবন ছিল বেশ নিরাপদ। আমি একা থাকি না দোকা থাকি সেটাও তো সবাই জানত না। কলকাতায় কে কাকে চেনে!

তবে আমি যে-ফার্মে চাকরি করতাম সেই ফার্মের একটি উজ্জ্বল সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলে আমার প্রতি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দু-একবার রেস্টুরেন্টে গেছি, বেড়িয়েছি এদিক-ওদিক। কিন্তু কী জানি তার প্রতি আমার কখনও কেন আগ্রহ জাগল না!

তবে সে একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

প্রভাসরঞ্জন

আমার জীবন শুরু হয়েছে কয়েকবার। শৈশবে যে-জীবন শুরু করেছিলাম দেশভাগের পর তা শেষ হয়ে যায়। নতুন এক রুক্ষ ভিখিরির স্নেহহীন জীবন শুরু করেছিলাম। মধ্যে যৌবনে বিদেশে গেলাম নতুন আর একরকম জীবন শুরু করতে।

কতবার কতভাবে শুরু হল, আবার শেষও হয়ে গেল। এখনও আয়ু অনেকটা পড়ে আছে, কতবার আরও নিজের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে হবে কে জানে?

ফেরার সময়ে সেই এরোপ্লেনেই যেমন, গেরিলারা যদি প্লেন হাইজ্যাক করে নিয়ে যেত, যদি মুক্তিপণ হিসেবে বন্দি করত আমাদের এবং যদি প্রতি ছ ঘণ্টা অন্তর এক-একজন যাত্রীকে গুলি করে

মেরে ফেলত তাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি হিসেবে? না, সে সব কিছুই হয়নি। না হলেও সেই কয়েকটা মুহূর্তের আকণ্ঠ মৃত্যুভয় আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল।

সেই রূপসী তরুণীটি দৈত্যকার লোকটির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কী বলছিল তা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। চোখের পলক না ফেলে হাঁ করে চেয়ে দেখছি দৃশ্যটা, আমার পাশে বসা বুড়োর নাকে বাঁশির শব্দ হচ্ছে, বুড়ি অস্পষ্ট স্বরে কেঁদে কী যেন বলছে বুড়োকে। প্লেনসুদ্ধ যাত্রীরা আতঙ্কে চেয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে।

মেয়েটা কথা বলতে বলতে এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। লোকটা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুখানায় বাদামি আগুন ঝলসাচ্ছে। তারা দুজন চারদিকে যাত্রীদের চোখকে গ্রাহ্য করছে না, যেন আর কেউ যে উপস্থিত আছে এ তারা জানেই না।

মেয়েটা খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেলে দৈত্য লোকটার চোখ-মুখ হঠাৎ খুব নরম হয়ে গেল। দুটো প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মতো হাতে লোকটা সেই পলকা মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর চকাস চকাস করে চুমু খেতে লাগল।

ঠিক এরকমটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ডানদিকে একটা লোক হেসে উঠল। পাশের বুড়ি বুড়োকে বলছে—ও গড, হি উইল ব্রেক দ্য গার্লস ব্যাক। পিছন থেকে একটা হাততালির শব্দ আসে। একজন বলে ওঠে—হ্যাপি এন্ডিং। পিছনের ইটালিয়ান বাচ্চাটা বিস্মিত স্বরে বলে ওঠে—ওরা কখন মারবে? চুমু খাওয়ার পর?

দুজন সুন্দরী হোসটেস এতক্ষণ সামনের দিকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল এদিকে চেয়ে। এবার তারা প্রাণ পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসে। দৈত্যটির পিঠে টোকা দিয়ে একজন জার্মান ভাষায় বলে—ইচ্ছে হলে আপনি বসতে পারেন। সামনের দিকে একটা টুইন সিট আছে।

লোকটা মেয়েটাকে খানিক নিষ্পিষ্ট করে মুখ তুলে বলে—ড্রিঙ্ক আনো, আমার তেষ্টা পেয়েছে।

পিছনে যেখানে আলিজা বসেছিল তার পাশের সিটে একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ ছিল। তাকে কেউ লক্ষ করিনি এতক্ষণ। সবাই ঘাড় ঘোরাচ্ছে দেখে আমিও পিছু ফিরে ছেলেটাকে দেখতে পাই। একটা বাদামি শার্ট গায়ে, গলার টাইটা আলগা, মুখটা অসম্ভব লাল, দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, সে এই প্রেমের দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না, অসম্ভব রেগে গেছে এবং এক্ষুনি সে একটা কিছু করবে।

কী সে করত জানি না, তবে দৈত্যকায় লোকটির বুকে সেঁটে থেকেই মেয়েটা একবার পিছু ফিরে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল তাকে! সে বসে পড়ল ধীরে ধীরে।

দৈত্য লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে আরও সামনের দিকে কোথাও গিয়ে বসল।

আমি হোসটেসকে ডেকে একটু ড্রিংকস চাইলাম। আর সেটি পরিবেশনের সময়ে জিজ্ঞেস করতেই সুন্দরী হোসটেসটি মৃদু স্বরে বলল—লাভ ট্র্যাংগল।

কিন্তু একটু বাদে পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে নিচু স্বরে কী যেন বলল অনেকটা সময় ধরে। তারপর দেখি, তরুণী হোসটেস ছাইরঙা এক আতঙ্কিত মুখে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে বেতার-ঘরের দিকে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হোসটেসের মুখের ভাব অনেকেই লক্ষ করেনি। তাই বেশির ভাগ লোক নিশ্চিন্তে বসে আছে। আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

বেইরুটে প্লেন থামতে দরজা খুলে কয়েকজন বিশালদেহী যাত্রী উঠল। তাদের চেহারা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। উঠে মুহূর্তের মধ্যে তারা প্লেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল চোখের পলকে দেখি তাদের হাতে হাতে উঠে এসেছে এল.এম.জি. কারবাইন, থমপসন অটোম্যাটিক। চারজন সেই দৈত্যের মতো লোকটা আর তার বিস্মিত বান্ধবীকে ঘিরে ফেলল। দুজন গিয়ে ধরল পিছনের ছেলেটিকে।

বাচ্চা হাতির মতো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে চাইল। রাগে তার মুখ টকটকে লাল। চেঁচিয়ে সে তার দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন গালাগাল করছিল পিছনের ছেলেটিকে। আর সেই ছেলেটিও কী যেন জবাব দিচ্ছে বেপরোয়া মুখে।

ছদ্মবেশী আর্মড গার্ড তিনজনকেই নামিয়ে নিয়ে গেল মেশিনগান আর অটোম্যাটিকের নল গায়ে ঠেকিয়ে। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে সার্চ করা হল প্লেন। গুঞ্জন শোনা গেল, ওই তিনজনই ছিল গেরিলা।

বেইরুটের পর তারা প্লেন হাইজ্যাক করত। প্রেমের ত্রিকোণ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে কী হত বলা মুশকিল। প্রেমে ব্যর্থ পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে তাদের সব গুপ্তকথা বলে দিয়েছিল।

গেরিলাদের ক্ষেত্রে এরকম বড় একটা হয় না, আমি জানি। সর্বত্রই আমি মৃত্যুপণ গেরিলাদের লক্ষ করে দেখেছি। প্রেম তাদের কাছে কোনও সমস্যাই নয়। আমার এখনও মনে হয় ওরা গেরিলা ছিল না। পিছনের ছেলেটি নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দিয়ে ইচ্ছে করেই গণ্ডগোল পাকিয়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের ঘটনা কী তা আমি আজও জানি না। কিন্তু প্লেন বেইরুট থেকে উড়লে মনে হয়েছিল, আমরা আবার জীবন ফিরে পেলাম। আমি যে-জীবন ফিরে পেলাম সেটা কেমন? সে-জীবন শেষ হলেই-বা কী ক্ষতি ছিল?

দমদমের দরিদ্র বাড়িটিতে এসে যখন পৌঁছোলাম তখন আমার বাবা-মা যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করলেন । ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই একটা বিয়ে করেছে। আমার ভাই, ভ্রতৃবধূও যথাসাধ্য খুশির ভাব দেখাল। ভাইয়ের সদ্য একটি ছেলে হয়েছে। আমি বিদেশ থেকে কিছু লোভনীয় জিনিস এনেছিলাম। সেগুলো বাড়ির লোকদের বিলিয়ে দিলাম। সবাই অসম্ভব খুশি হল তাতে। একেই তারা ভাল জিনিস চোখে দেখেছে কম, তার উপরে এত সব হরেক রকম মহার্ঘ দ্রব্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এই উত্তেজনা বাড়াতে আমার বোনেরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা আর স্বামী নিয়ে চলে এল বেড়াতে। খুবই হতাশ হই তাদের দেখে। দুই ভগ্নিপতির মধ্যে একজনকে দেখলেই মনে হয় লোফার। অন্যজন কিছুটা ভদ্রলোক আর সুপুরুষ হলেও নির্বোধ। কারওরই সংসারের অবস্থা ভাল নয়। মা আমাকে চুপি চুপি জানাল, ছোট জামাই নাকি গুণ্ডামি, চুরি, ছিনতাই করে। বড়জন একটা প্রাইভেট ফার্মে কেয়ারটেকার।

এরা সব এক জায়গায় জুটতে খুব হট্টগোল হল। ঝগড়াঝাঁটিও প্রায়ই লেগে যায় দেখলাম। একদিন বাবা খুব গম্ভীরভাবে আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে বললেন—শোনো বাবা প্রভাস, তোমার ছোট ভাই আর তার বউ এখন চায় আমি আর তোমার মা আলাদা হয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—আপনি আর মা যাবেন কেন? এ বাড়ি তো আপনার, দরকার হলে ওরা চলে যাবে।

—সে সব আইনের কথা শুনছে কে? আমাদের বুড়ো বয়সে আর তেমন তেজ নেই যে গলাবাজি করে গায়ের জোরে দখল রাখব। তার উপর নিজের সন্তান যদি শত্রুতা করে, তবে আর কী করার আছে? ওরা দুজনে মিলে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে দিন-রাত। তোমার মা অবশ্য ওদের দিকে টেনে চলেন, কিন্তু তাতেও সুরাহা হবার নয়। যদিও-বা তোমার মাকে ওরা আশ্রয় দেয় আমাকে থাকতে দেবে না।

কথাটা শুনে আমি ভয়ঙ্কর রেগে যেতে পারি। হঠাৎ কেন যেন নিজের ছেলেবেলার কথা আদ্যন্ত মনে পড়ে! ভাবি, আমাদের নিষ্ঠুর ছেলেবেলা আমাদের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কী শেখাবে! আমার ভাই তার নিজের জীবন ও পরিবেশ থেকে সেই শিক্ষাটাই নিয়েছে। ওর বউও খুব উঁচু পরিবারের মেয়ে নয়। কথায় কথায় মা একদিন বলে ফেলেছিলেন, বউমার মা নাকি ঝিগিরি করত। তবে আগে ওরা ভদ্রলোক ছিল, অবস্থার ফেরে এই দশা। সে যাই হোক, আমার ভাইয়ের বউ নিমি খুব খোঁপায় চোপায় মেয়ে। টকাটক কথা বলে, মেজাজ দেখাতে ভয় পায় না, কাউকে তোয়াক্কার ভাব নেই। এ ধরনের মেয়েরা সহজেই স্বামীকে বশ করতে পারে। মা-বাবাকে আলাদা করার প্রস্তাবটি হয়তো তার মাথাতেই প্রথম এসে থাকবে। যথাসময়ে আমার ভাই সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

বাবাকে বললাম—বোঝাপড়া করে নিন। আমিও বলব'খন।

বাবা বললেন—এ বাড়ির অর্ধেক স্বত্ব তোমারও। আমি বলি কী, তুমি যখন এসেই গেছ ভাল সময়ে, তখন বাড়িটা ভাগ করে নাও। আমি তোমার ভাগে থাকব, তোমার মা না হয় তাঁর ছোট ছেলের কাছে ইচ্ছে হলে থাকবেন।

শুনেই আমার গা রি-রি করে ওঠে। এই ঘিঞ্জি কলোনির তিন কাঠা জায়গায় দীনদরিদ্র একটুখানি দরমার বাড়ি—এর আবার ভাগ-বাঁটোয়ারা! তার উপর এখানে স্থায়ী ভাবে থাকার ইচ্ছেও আমার কখনওই হয়নি। নিজের আত্মীয়স্বজন আমার এখন আর সহ্য হয় না।

আমি বললাম ভাগ বাঁটোয়ারা করার ইচ্ছে হয় না। এইটুকু জায়গা ভাগ করলে থাকবে কী?

বাবা বলেন—তবে বাবা, তুমি আলাদা কোথাও বাড়ি করো, বুড়ো বয়সে আমি গিয়ে তোমার কাছে শান্তিতে মরি।

আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলি—বরাবরই কি আপনাদের বোঝা আমাকে বইতে হবে না কি? একটা জীবন সংসারের পিছনে অপচয় করেছি। এখনও কি আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না?

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন—তোমাকে কোন কাজে কবে বাধা দিলাম বলো তো। ঠিক কথা তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, কিন্তু অত ভাল সরকারি চাকরি ছেড়ে বিদেশে গেলে, আমরা তো বাধা দিইনি। এত বছর তো আমরা তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকিনি। এই বুড়ো বয়সে এখন আর তোমরা ছাড়া আমাদের অভিভাবক কে আছে।

আমার নিষ্ঠুর মন এখন আর সহজে গলে না। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, আচ্ছা, সুহাসের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ভাগ করে দেব, আপনারা আমার ভাগেই থাকবেন। কিন্তু আমি এ বাড়িতে থাকব না।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

বাসায় খুব ভাল লাগে না। কারণ, এখানে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই, সারা পৃথিবীতে কেউ নেই, একমাত্র নীলু ছাড়া। বোন ভগ্নিপতিরা চলে গেল, তবু বাড়িতে গণ্ডগোল থামে না। প্রায় সারাদিনই সুহাসের বউ নিমি-বাবাকে বকাবকি করে। মা খুব একটা পালটা ঝগড়া করে না, কিন্তু ছেড়েও দেয় না। বাবা মাঝে মাঝে লাঠি হাতে তেড়ে ছেলের বউকে মারতে যায়। অমনি নিমি বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে ই-ইঃ মারবে! মারুক তো দেখি! বলে চেঁচায়। বাবা ভয়ে পিছিয়ে আসে, আর নিমি তখন এক নাগাড়ে যাচ্ছেতাই বলে যায়। আমি যে বিদেশ-ফেরতা ভাসুর বাড়িতে আছি তা গ্রাহ্য করে না। ঝিয়ের মেয়েই বটে। সুহাস কোথায় কাজ করে তা আমি এখনও ভাল জানি না, তবে যা-ই করে, তা যে খুব উঁচু ধরনের কাজ নয় তা ওর আচার-আচরণ থেকেই বোঝা যায়। ওর সহকর্মীরা যে নিচুতলার লোক তা সুহাসের কথা শুনলেও টের পাই। কথায় কথায় মুখ খারাপ করে ফেলে। একটু আড়াল হয়ে বিড়ি-টানে দেখি। বউকে নিয়ে সপ্তাহে দুবার নাইট শো দেখতে যায়।

বাড়ির খাওয়াদাওয়া অত্যন্ত নিচু মানের। আমি এসে অবধি বাড়িতে বেশ কিছু সংসার খরচ দিয়েছি, তবু খাওয়ার মান ওঠেনি তেমন। তবে মাঝে মাঝে আমার মুখরক্ষা করতে মুরগি রান্না হয়। প্রথম দিন আমাকে খাওয়ার সময়ে কাঁটা-চামচ দেওয়া হয়েছিল দেখে হেসে ফেলেছিলাম।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। বাইরে বাইরে খামোকা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথাও যাওয়ার ঠিক থাকে না। চাকরি-বাকরি করব, না ব্যবসা করব, তা নিয়ে ভাবি না। বেশ একটা ছুটি-ছুটি মনের ভাব নিয়ে আছি।

বিদেশে আমার যে টাকা জমেছিল তা নেহাত কম নয়। এ দেশের মুদ্রামানে প্রায় লাখ চারেক টাকা। তাই এখনই চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

পাঁচুদার সঙ্গে খাতির ছিল। তার খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম ভদ্রলোক মরতে চলেছেন।

অলকা

উঠে পড়লাম।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঝি সরস্বতী আজ আসবে কি না বুঝতে পারছি না। এত বেলা তো সে কখনও করে না! আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এক রিকশাওলার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার কাছে একশোটা টাকা চেয়েছিল। দেব কোত্থেকে? আমার বাড়তি টাকা যা আছে তা বড় অল্পে অল্পে জমানো। দিই কী করে?

দাঁত মেজে এক কাপ চা করে খেলাম। বিছানা তুলতে ইচ্ছে করছে না। থাকগে, কে-ই-বা আসছে দেখতে! সরস্বতী যদি আসে তো তুলবেখন। সকালের চা করা, বিছানা তোলা এসব ও-ই করে।

আমি খবরের কাগজ রাখি না। ছোট্ট একটুখানি একটা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো আছে। সেটাই আমার

সঙ্গী। অবশ্য এ ফ্লাটে মস্ত একটা রেডিয়োগ্রাম আছে অসীমদার, কিন্তু সেটার যন্ত্রপাতিতে মরচে, চলে না। আমার ট্রানজিস্টার সেটটারও ব্যাটারি ডাউন। চেরা আওয়াজ আসে। রেডিয়োটা চালিয়ে একটা ফ্যাসফেসে কথিকা হচ্ছে শুনে, বন্ধ করে দিলাম।

আজ ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনগুলোই আমার অসহ্য। সময় কাটতে চায় না। শ্রীরামপুরের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু গেলেই অশান্তি। মাসির বাড়িতেও যাওয়া হয় না। রোহিতাশ্ব চৌধুরীর বাড়িতে যেতে কেমন যেন লজ্জা করে আজকাল, ওদের বাড়িতে বেবি সিটারের চাকরি করেছি বলেই বুঝি এক হীনম্মন্যতা কাজ করে।

মুশকিল হল, আমার বাসাতেও কেউ আসে না। আজ রোববারে কেউ কি আসবে? আসবে না, তার কারণ আমাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। আমার তেমন বন্ধুবান্ধবও নেই। মাঝে মাঝে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

এখনও বর্ষা নামেনি এ বছর। গরমকালটা বড় বেশিদিন চলছে। এইসব ভয়ংকর রোদের দিনে ঘরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেও হতে চায় না। একা ঘরে সারা দিনটা কাটাবই-বা কী করে?

জানালা-দরজা খোলা। আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। আমি বাথরুমে ঘুরে এসে আয়নার সামনে বসে একটু ফিটফাট করে নিই নিজেকে। চুল আঁচড়াই, মুখে অল্প একটু পাউডার মাখি, কপালের একটা ব্রণ টিপে শাঁস বের করি। বেশ চেহারাটা আমার। লম্বা টান সতেজ শরীর, গায়ে চর্বি খুব সামান্য, মুখখানা লম্বা ধাঁচের, পুরু কিন্তু ভরন্ত ঠোঁট, দীর্ঘ চোখ। নাকটা একটু ছোট কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। গায়ের রঙে জেল্লা আছে।

অনেককাল নাচি না। আজ একটু ইচ্ছে হল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটু পা কাঁপিয়ে নিলাম। তারপর কয়েকটা সহজ মুদ্রা করে নিয়ে ধীরে ধীরে নাচতে থাকি। কিন্তু বুঝতে পারি শরীর আর আগের মতো হালকা নেই। বেশ কষ্ট হয় শরীর ভাঙতে, দমও টপ করে ফুরিয়ে গেল। হাঁপিয়ে বসে পড়লাম। তাতেও হল না। পাখা চালিয়ে শুয়ে রইলাম মেঝেয়। ঠাণ্ডা মেঝে, বুক জুড়িয়ে গেল। শুয়ে থেকে হঠাৎ মনে হল আজ কেউ আসবে। অনেককাল কেউ আসে না। আজ আসবে। ভাবতে ভাবতে ঝিমধরা মাথায় কখন যে তন্দ্রা এল। সরস্বতী আসেনি, হরিণঘাটা ডিপো থেকে দুধের বোতল আনা হল না। একটু আনাজপাতি, মাছ বা ডিম কিছু আনিয়ে রাখা দরকার ছিল। তাও হল না। সকালের জলখাবার বলতে কিছু খাইনি এখনও, খিদে পেয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতেও তন্দ্রা এল। কী আলিস্যি আর অবসাদ যে শরীরটার মধ্যে। বয়স হচ্ছে নাকি! মাগো!

খুব বেশিক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকা হল না। পিয়ানোর হালকা শব্দ তুলে কলিং বেল পিং আওয়াজ করল। সদর দরজাটা ভেজানো আছে, সরস্বতী হলে বেল না বাজিয়ে হুড়ুম দুড়ুম করে ঢুকে পড়ত। এ সরস্বতী নয়, অন্য কেউ।

দরজা খুলে একটু খুশিই হই। আমার অফিসের সেই স্মার্ট ও সুপুরুষ যুবক সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। যদিও সুকুমারকে আমি সেই অর্থে ভালবাসি না, তবু ওর সঙ্গ তো খারাপ নয়। জানি না বাপু আমাদের মনের মধ্যে কী পাপ আছে। পাপ একটু-আধটু আছে নিশ্চয়ই। নইলে সুকুমারের ওই দুর্দান্ত বিশাল জোয়ান চেহারা আর হাসির জবাব রঙ্গ-রসিকতায় ভরা কথাবার্তা আমার এত ভাল লাগে কেন। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' করে বলি, সেটাও পাঁচজনের সামনে নয়, দুজনে একা হলে তবেই। তা হলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটু পাপ-টাপের গন্ধ পাওয়া যাবে।

বাইরের ঘরে বসে ও তেমনি হাসি মুখে বলল—তোমাকে একটু বিরহী বিরহী দেখাচ্ছে অলি।

ওর হাসিটা যেন একটু কেমন। মানুষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়লে মাঝে মাঝে ও রকম হাসি হাসে। ওর মতো চটপটে বুদ্ধিমান ছেলের নার্ভাস হওয়ার কথা নয়।

আমি বললাম—বিরহ নয় বিরাগ। বোসো, আজ আমার ঝি আসেনি; নিজেকেই চা করতে হবে।

ও বিরস মুখ করে বলে—ও, আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় আজ ভাত খাব দুপুরে। কিন্তু ঝি যখন আসেনি—

কথাটা আমার কানে ভাল শোনাল না। ভাত খাবে কেন? এ প্রস্তাবটা কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না।

আমি বললাম—আমি নিজে কতদিন না রেঁধে শুকনো খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিই। আজও অরন্ধন।

সুকুমার নড়েচড়ে বসে বলল— এসে তোমার ডিসটার্ব করছি না তো?

—মোটেই নয়। আজ আমার খুব একা লাগছিল।

—আমারও।

—মনে হচ্ছিল কেউ আসবে।

সুকুমারের মুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বলে—কে আসবে বলে ভেবেছিলে? আমি?

—না। বিশেষ কারও কথা নয়। যে কেউ।

—আমার কথা তুমি ভাবো না অলি?

পুরুষমানুষদের এই এক দোষ। তারা চায় মেয়েরা সব সময় তাদের কথা ভাবুক। বড় জ্বালা। জয়দেবও বোধহয় তাই চাইত।

আমি একটু হেসে বললাম—ভাবব না কেন? তবে আমার ভাবনা খুব ভাসা ভাসা। গভীর নয়।

সুকুমারের স্মার্টনেস আজ যে কোথায় গেল! সে আজ একদম বেকুব বনে গেছে। মুখের রং অন্যরকম, চোখ অন্যরকম। আমি বাতাসে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আজ সুকুমার খুব ভাল পোশাক পরে এসেছে। সাদা রঙের ওপর নীল রঙের নকশা করা পাতলা টেরিভয়েলের ছ্যাঁদাওয়ালা জামা, খুব সুন্দর ধূসর রঙের প্যান্ট পরা, পায়ে ঝকঝকে মোকাসিন। হাতে এই ছুটির দিনেও একটা পাতলা ভি আই পি স্যুটকেস। রুমালে মুখ মুছে বলল—আমি হঠাৎ এলাম বলে কিছু মনে করো না।

আমি হেসে বললাম—তুমি এর আগেও একবার এসেছিলে, তখনও কিছু মনে করার ছিল না। মনে করব কেন?

সুকুমার ভাল করে কথা বলতে পারছে না আজ। আমার দিকে ভাল করে তাকাচ্ছেও না। বলল—ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে আমার।

—কেন, খারাপের কী? সদ্য একটা লিফট পেয়েছ!

সুকুমার ব্যথিত হয়ে বলে—সবসময়ে টাকার পয়েন্টে লোকের ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। সে সব নয়। আমার মনটা ভাল নেই।

—কেন?

—তোমার সেটা বোঝা উচিত।

আমি এ ব্যাপারে খানিকটা নিষ্ঠুর। সুকুমার কী বলতে চায় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু এসব প্রস্তাবকে গ্রহণ বা গ্রাহ্য করা আমার সম্ভব নয়। বললাম—তোমার প্রবলেম নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন? আমার ভাববার মতো নিজস্ব প্রবলেম অনেক আছে।

—অলি, তুমি কিন্তু সেলফ সেন্টারড।

—সবাই তাই। তুমিও কি নিজের স্বার্থ থেকেই সব বিচার করো না?

সুকুমার সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। ওর হাত বশে নেই। বলল—সেটা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে হ্যাপি নও এটা নিয়েও আমি ভাবি।

আমি হেসে বললাম—সেটা ভাবতে না, যদি আমার ওপর তোমার লোভ না থাকত।

—লোভ! বলে আঁতকে উঠল সুকুমার। বলল—লোভ অলি? লোভ কথাটা কত অশ্লীল তুমি জান? লোভের কথা বললে কেন?

—তবে কী বলব, প্রেম? ভালবাসা?

সুকুমার অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে—আমি তো তাই ভাবতাম।

মাথা নেড়ে বললাম—পুরুষমানুষ আমি কম দেখিনি। লোভ কথাটাই তাদের সম্বন্ধে ঠিক কথা। পুরুষেরা মেয়েদের চায় বটে, কিন্তু সে চাওয়া খিদের খাবার বা নেশার সিগারেটের মতো।

—তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা। বলে সুকুমার হাসে একটু। বলে—সে থাকগে। তর্ক করে কি কিছু প্রমাণ করা যায়? বরং যদি আমাকে একটা চানস দিতে অলি, দেখতে মিথ্যে বলিনি।

—চা করে আনব?

—আনো।

চা খেয়ে সুকুমার নিজের হাতের তেলোর দিকে নতমুখে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ।

আমার একটু মায়া হল। ও আমাকে ভয় পাচ্ছে। এত বড় চেহারা, এত ভাল দেখতে, তবু নরম গলায় বললাম—কী বলবে বলো।

—কী বলব, বলার নেই।

—শুধু বসে থাকবে?

—না, উঠে যাব। এক্ষুনি।

—সে তো যাবেই জানি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আজ তুমি কী একটা বলতে এসেছিলে।

সুকুমার হঠাৎ তার যাবতীয় নার্ভাসনেস ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মরিয়া হয়ে খাড়া উঠে বসল। আমার দিকে সোজা অকপট চোখে চেয়ে বলল—শোনো অলি, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। অনেক চেষ্টা করেছি মনে মনে, পারিনি।

এ সব কথা শুনলে আমার হাই ওঠে। অবাস্তব কথা সব, একবিন্দু বিষয়বুদ্ধি নেই এ সব আবেগের মধ্যে। আমি এঁটো কাপ তুলে নিয়ে চলে আসি। বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একা। ভাল লাগে না।

হঠাৎ সুকুমার ঘরের বাইরের থেকে ভিতরে চলে এল, খুব কাছে পিছনের দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দু কাঁধ আলতো হাতে ধরে অল্প কাঁপা গলায় আর গরম শ্বাসের সঙ্গে বলল—অলি, এর চেয়ে সত্যি কথা জীবনে বলিনি কাউকে। গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। কিছুই ভাল লাগছে না, তাই আজ দীঘা যাওয়ার টিকিট কেটে এনেছি।

—যাও ঘুরে এসো। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেক রোগ সেরে যায়, এটাও হয়তো যাবে।

—রোগ! কীসের রোগ! আমার কোনও রোগ নেই।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে হিলহিল করে। সেই দিকে চেয়ে থেকে বললাম—কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নাও, তোমার হাত ভীষণ গরম।

এ সব সময় যা হয়, তাই হল। অপমানিত পুরুষ যেমন জোর খাটায়, তেমনি সুকুমারও আমাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। একটা বিরক্তিকর অবস্থা।

হটাৎ সরস্বতীর ভৌতিক গলা চেঁচিয়ে উঠল—উরেব্বাস, এ কী গো!

সুকুমার প্রায় স্ট্রোকের মুরগির মতো অবশ হয়ে টলতে টলতে সরে গেল। সরস্বতী দরজায় দাঁড়িয়ে। লজ্জায় মরে গিয়ে বললাম—এই হচ্ছে তোমাদের দাদাবাবু। ফেরাতে এসেছে।

জয়দেব আর আমার বিয়ে ভাঙার ব্যাপার সরস্বতী জানে। তাই সে বুঝল সুকুমারই হচ্ছে সেই জয়দেব। খুব হাসিমুখে বলল—তা হলে এত দিনে বাবুর মতি ফিরেছে, ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে!

আমি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম—দেরি করলে যে বড়! সারা সকাল আমি কিছু খাইনি জানো!

—কী করব দিদি, টাকার জোগাড় করতে সেই মোমিনপুর গিয়েছিলাম কুসমীর কাকার কাছে। সে পানের দোকান করে। পয়সা আছে। দয়া-ভিক্ষে করতে পাঁচশোটা টাকা দেবে বলেছে।

আমি বললাম—কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারো তো। বোকো না।

—দাদাবাবুর জন্য মিষ্টি-টিষ্টি এনে দেব নাকি? দাও তা হলে পয়সা। চায়ের জল চড়িয়ে দোকান থেকে আসি।

কঠিন গলায় বললাম—না।

বসবার ঘরের ঠিক মাঝখানটায় সম্পূর্ণ গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সুকুমার। ভাল পোশাক, চমৎকার চেহারা, তবু কী অসহায় আর বোকা যে দেখাচ্ছে!

আমি হেসেই বললাম—মাথা ঠাণ্ডা রেখো, বুঝলে? আমারও তো কিছু নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে।

—সে জানি।

—ছাই জানো। আমার স্বামী লোকটা খুব খারাপ নয়। অন্তত লোকে তাকে খারাপ বলে না। তবু তাকে আমার পছন্দ হয়নি বলেই তার সঙ্গে থাকিনি। তুমি কি ভাবো আমি একা থাকি বলে খুব সহজে

বশ করে নেওয়া যাবে আমাকে?

—তুমি কখনওই আমাকে বুঝলে না অলি। বোধহয় ভালবাসা তুমি বুঝতেই পারো না। থাকগে, যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দিয়ো।

সুকুমার চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—এখন কি সোজা দীঘায় যাবে।

সুকুমার হতাশ গলায় বলল—দীঘায় একা যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিল না।

—তা হলে?

—ইচ্ছে ছিল তোমাকেও নিয়ে যাব। দুটো কটেজ বুক করে রেখেছি, সরকারি বাসে দুটো টিকিট কেটে রেখেছি। কিন্তু সে সব ক্যানসেল করতে হবে।

ওর দুঃসাহস দেখে আমি হতবাক। বলে কী! আমাকে নিয়ে দীঘা যেতে চেয়েছিল?

কিন্তু এ বিস্ময়টা আমার বেশিক্ষণ থাকল না। ওরকম পাগলামির অবস্থায় মানুষ অনেক বেহিসেবি কাজ করে। বললাম—আমাকে দীঘায় নিয়ে কী করতে তুমি?

সুকুমার মনোরুগির মতো হাসল একটু। বলল—আমাকে বিশ্বাস কোরো না অলি। আমার মাথার ঠিক নেই। কত কী ভেবে রেখেছি, কত কী করতে পারি এখনও।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—এ সব ভাল নয়। তুমি আমার ক্ষতি ছাড়া কিছু করতে পারো না আর।

—বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ। আমি নিজেকেও আর বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম—দাঁড়াও, এক্ষুনি চলে যেয়ো না।

—কেন?

—মনে হচ্ছে, তুমি একটা বিপদ করবে। বসে একটু বিশ্রাম করো। আর বরং দুপুরে এখানেই খেয়ে যাও।

সুকুমার বসল।

সুকুমার প্রায়ই এর ওর হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে। আসলে ও হাত দেখার কিছুই জানে না, কেবল ব্লাফ মারে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বানায় বেশ চমৎকার। নতুন ধরনের কথা বলে। কাউকে হয়তো বলে, শীতকালটায় আপনি খুব বিষণ্ণ থাকেন। আমাদের অফিসের বড়কর্তাকে একবার বলেছিল—সামনের মাসে আপনাকে চশমার পাওয়ার পালটাতে হবে, একটা দাঁত তোলাবেন ফেব্রুয়ারি মাসে। এই রকম সব। অফিসের মেয়েদের হাত দেখে এমন সব কথা বলে যে মেয়েরা পালাতে পারলে বাঁচে। একবার আমার হাত দেখে সুকুমার বলেছিল—শুনুন মহিলা, আপনার একটা মুশকিল হল আপনি সকলের সঙ্গে বেশ সহৃদয় ব্যবহার করতে ভালবাসেন। স্নেহ-মায়া আপনার কিছু বেশি। কিন্তু তার ফলে লোকের সব সময়ে মনে হয় যে আপনি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন বা প্রেমে পড়েছেন। একটু রূঢ় ব্যবহার করতে শিখুন, ভাল থাকবেন।

কী ভীষণ মিথ্যে কথা, আবার কী ভীষণ সত্যিও! সুকুমারের ওই ভুয়ো ভবিষ্যদ্বাণী তার নিজের সম্পর্কে কেমন খেটে গেল।

স্নেহবশে মায়ায় ওকে আমি দুপুরে খেয়ে যেতে বললাম। আসলে ওই ছুতোয় ওকে একটুক্ষণ আটকে রাখার জন্য। নইলে ওর যেরকম মনের অবস্থা দেখছি, হয়তো রাস্তায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে। আর সেই আটকে রাখাটাই বুঝি ভুল হল। সুকুমার ভাবল, আমার মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, আমি ওকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছি।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুকুমার বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরাল। সরস্বতী চলে গেছে, কাল সকালে ফের আসবে। যাওয়ার আগে সে সুকুমারের সঙ্গে কিছু তরল রসিকতাও করে গেল আমাকে নিয়ে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম সুকুমার এখন চলে যাক। সুকুমার গেল না। সারা বেলা আমাদের খুব একটা কথা হয়নি। আমি রান্নাঘরে রেঁধেছি, সুকুমার বাইরের ঘরে বসে বইপত্র পড়েছে।

দুপুরে রোদ আর গরমের ঝাঁঝ আসে বলে দরজা-জানালা সরস্বতী যাওয়ার আগেই বন্ধ করে দিয়ে যায়। বেশ অন্ধকার আবছায়ায় সুকুমারের সিগারেট জ্বলছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ছুটির দিনে আত্মীয়স্বজন কেউ যদি হুট করে চলে আসে, তো আমার কোনও সাফাই কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু

সুকুমারকে কী করে চলে যেতে বলি?

মুখোমুখি বসেছিলাম। বললাম—তুমি কি বিশ্রাম করবে, না যাবে এক্ষুনি?

সুকুমার আয়েসের স্বরে বলল—এই গরমে বের করে দেবে নাকি?

—তা বলিনি—বলে অস্বস্তিতে চুপ করে থাকি। ভেবে-চিন্তে বললাম—তা হলে এ ঘরে বিশ্রাম নাও। আমি ও ঘরে যাই।

শোওয়ার ঘরে এসে কাঁটা হয়ে একটু শুতে-না-শুতেই আবছা একটা মূর্তি এসে হঠাৎ জাপটে ধরল আমাকে। সুকুমার। আমি প্রতিমুহূর্তে এই ভয় পাচ্ছিলাম। ওর শ্বাস গরম, গা গরম, উন্মাদের মতো আশ্লেষ। ও খুনে গলায় বলল—তোমাকে মেরে ফেলব অলি, যদি রাজি না হও আমাকে বিয়ে করতে।

আমার কোনও কথাই ও শুনতে পাচ্ছে না। গ্রাহ্য করছে না আমার কিল, ঘুষি, আঁচড়, কামড়।

হঠাৎ বহুকাল নিস্তব্ধতার পর বিপদসঙ্কেতের মতো টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে সুকুমার একটু থমকাল। আমি নিজেকে সামলে গিয়ে টেলিফোন তুলে বললাম—হ্যালো।

একটা গম্ভীর গলা বলল—আপনার ঘরে কে রয়েছে?

এত ভয় পেয়েছিলাম যে রিসিভার হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কে বলছেন?

উত্তর এল—ওই লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিন।

টেলিফোনটা কেটে গেল আচমকা!

প্রভাসরঞ্জন

সকাল থেকেই আজ মেজাজে আছি। কোনও খুশখবর নেই, মন ভাল থাকার কোনও কারণও দেখছি না, তবু কেন মনটা নবাবি করছে?

ওই রকম হয় মাঝে মাঝে। বেঁচে থাকাটাকে যখন শবদেহ বহনের মতো কষ্টকর লাগে সব সময়ে, তখন মাঝেমধ্যে বুঝি প্রাকৃতিক নিয়মে মরবার আগে হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠার ছদ্ম লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়ে এক বিন্দু খুশি মিশিয়ে দেন জীবনে। তখন বুঝতে হয় যে কঠিন দিন আসছে।

সে যাকগে। অতীতের চিন্তা আর ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়ে এখনকার খুশির মেজাজটাকে নষ্ট করার মানেই হয় না। দীর্ঘদিন ইউরোপে থেকে শিখেছি, বর্তমানটাকে যতদূর সম্ভব উপভোগ করাটাই আসল। যে সময় চলে গেছে বা যে সময় আসেনি, তার কথা চিন্তা করা এক মস্ত অসুখের কারণ। যদি আমুদে হতে চাও তো সে চিন্তা ছাড়ো।

প্রায় এক মাস হয়ে গেল দমদমের বাড়ি ছেড়ে পার্ক সার্কাসে চলে এসেছি। স্থায়ীভাবে এসেছি এ কথা বলা যায় না। মা-বাবাকে সেরকম কিছু বলে আসিনি। তবে দমদমে বাড়িতে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। সেখানে বড্ড বেশি অশান্তি। আমার ভ্রাতৃবধূটি বাড়িটাকে নরক করে তুলেছে।

একদিন বীভৎস ঝগড়ার পর আমি ভাইকে ডেকে বললাম—পাড়ার পাঁচজনকে ডাকো, বাড়ি ভাগ হোক।

তাতে সুহাসের আপত্তি। সে বলে—ভাগাভাগি কীসের!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—বাবা চাইছেন তোমার-আমার মধ্যে ভাগ করে দিতে।

সে বলল—তুমি তো আর এখানে থাকবে না! চলেই যাবে অন্য কোথাও। তবে ভাগ করব কেন?

সুহাসের বউও তেড়ে এল—আপনার কোনও দাবি নেই। আপনি তো বাইরের লোক হয়ে গেছেন। আমরা থাকি, বাড়িতে আমাদের স্বত্ব বেশি।

কথাটা অযৌক্তিক, কিন্তু এত জোর দিয়ে বলল যে আমি খুব অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমার মাও, কেন জানি না, বাড়ি ভাগাভাগির বিরুদ্ধে। কেবল বাবা ভাগাভাগি চাইছেন, এবং খুব মরিয়া হয়ে চাইছেন। কাজেই ফের ঝগড়া লেগে গেল।

নিমি আমাকে স্পষ্ট বলল—আপনার তো চরিত্র খারাপ। বিদেশে কী সব করে বেড়িয়েছেন তা কি

সুহাস নিমির পক্ষ নিয়ে বলে—তোমাকে তো ওদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই এসে ঘাড়ে পড়েছ। বেশি স্বত্ব-টত্ব দেখিয়ো না, খারাপ হয়ে যাবে। এ পাড়ায় এখনও আমার এক ডাকে দুশো লোক চলে আসবে।

সুহাসের কথা শুনে খুব অবাক হই না। এরকমটাই আশা করছিলাম এতদিন। আর ও কথাটা ঠিক, এ পাড়ায় ওর বেশ হাঁক-ডাক আছে।

এ রকম কুৎসিত পরিস্থিতিতেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি। ঝগড়া, মারামারি, পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি এ সবই আমাকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করেছে বহুবার।

ভয়টয়ও বড় একটা হল না। শুধু ঠাণ্ডা গলায় সুহাসকে বললাম—বাড়ি ভাগ ঠেকাতে পারবে না। দরকার হলে আমি পুলিশকে খবর দেব, বলব যে তুমি আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! সুহাস আর তার বউ ঝগড়ার চোটে প্রায় নাচতে লাগল। সুহাস তড়পায়, পেছন থেকে নিমি তাকে সাহস দেয়। শক্তিদায়িনী নারী কাকে বলে জানলাম! দুজনেই দিগ্বিদিকশূন্য, কাপড়-চোপড় গা থেকে খসে পড়ছে প্রায়।

এ বাড়ি ভাগ করা যে আমার কর্ম নয় তা বুঝলাম। ভীমরুল চাক বেঁধেছে, ঢিল মারলে রক্ষে নেই। বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললাম—দেখছেন তো ওদের অ্যাটিচুড। বাড়ি ভাগ কী করে হবে?

বাবা অসহায়ভাবে বললেন—তুমি আলাদা বাসা করো।

সেই পুরনো কথা। বিরক্ত হয়ে বলি—সেটা সম্ভব নয়। আলাদা বাসা করলেও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আমার একা থাকা দরকার।

বাবা চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন—বাবা প্রভাস, আমি সারা জীবন কখনও সুখে থাকিনি। গত জন্মের দোষ ছিল বোধহয়। তা এখন কী করতে বলো আমাকে? গলায় দড়ি দেব?

আমি কিছু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি।

বাবা বললেন—তুমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছ দেখে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। বিশ্বাস ছিল, তুমি আমাকে ফেলবে না। কিন্তু এখন—

আমি বললাম—তার চেয়ে কোনও বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে—

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—কোনও আশ্রম-টাশ্রমে যদি বন্দোবস্ত হয়, তা হলে?

বাবা মাথা নাড়লেন। চোখে বুঝি জল এসেছিল, সেটা মুছে নিয়ে বললেন—বুঝেছি। আপত্তি কী? তাই না হয় দেখো।

বাবাকে ভরসা দিয়ে বললাম—টাকা যা লাগে আমি কষ্ট করে হলেও দেবখন।

—সে জানি। দিয়ো। তোমরা না দিলে গতি কী?

যোগাযোগ করে নানা মুরুব্বি ধরে বাবার জন্য কাশীতে একটা বন্দোবস্ত হল। মাসখানেক আগে বাবা একখানা তোরঙ্গ আর শতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা নিয়ে ট্রেনে চাপলেন।

মার জন্য খুব চিন্তা নেই। মা যেন কীভাবে এই সংসার প্রোথিত বৃক্ষের মতো রয়েই গেল। সাধারণত শাশুড়ির সঙ্গে বউদের অবনিবনা দেখা যায়। আমাদের বাড়িতে উল্টো নিয়ম দেখি। তার মানে এই নয় যে নিমিতে আর মাতে ঝগড়া হয় না। বরং খুবই হয়। কিন্তু সুহাসের বুঝি মায়ের প্রতি একটু টান আছে। বাড়িতে ঢুকেই বিকট একটা 'মা' ডাক দেয় রোজ। আর একটা ব্যাপার হল, এ সংসারে হাজারো কাজে মা জান বেটে দেয়। বিনি মাগনা কেবল খোরাকি দিয়ে এমন বিশ্বস্ত ঝি-ই-বা নিমি কোথায় পাবে? তাই ঝগড়াঝাঁটি হলে, মাকে ফেলতে চায় না। মায়েরও আবার সুহাসের ওপর টান বেশি। এ সব টানের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। সবচেয়ে অপদার্থ ছেলেটাকেই মা কেন ভালবাসে তা বিশ্লেষণ করা বৃথা।

বাড়ির এই পরিস্থিতিতে যখন আমি বাড়ি ছাড়ব-ছাড়ব ভাবছি, সেই সময়ে মুমূর্ষ পাঁচুদা একদিন আমাকে বললেন—তোর যখন বনছে না তখন আমার বাসাটায় গিয়ে থাক না কদিন। তালাবন্ধ পড়ে আছে।

বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে। শোনার পর অপেক্ষা করিনি। সে রাতটা ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই

পাঁচুদার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি।

ব্যাচেলার মানুষ পাঁচুদা। ঘরে রান্নাবান্নার সব বন্দোবস্ত রয়েছে। আসবাবপত্রও কিছু কম নেই। সারাজীবন নিজের শখ শৌখিনতার পিছনে অজস্র টাকাপয়সা ঢেলে গেছেন। টাকাপয়সা জমাননি বড় একটা। ঠকবাজেরাও লুটেপুটে নিয়েছে। ফ্ল্যাটে এসে শুনলাম ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। অথচ বাথরুমে গিজার, ঘরের মেঝেয় কার্পেট, রান্নাঘরে মিনি রেফ্রিজারেটার—কী নেই?

হাসপাতালে দেখা করতে গেলে পাঁচুদা বললেন—যদি আমি বেঁচে যাই তো আলাদা কথা, নইলে ওই ফ্ল্যাট তোকেই দিয়ে গেলাম। সব জিনিসপত্রসুদ্ধু।

আমি বললাম—অত কিছু বলার দরকার নেই পাঁচুদা। আপনি মরছেন না শিগগির। আপাতত কিছুদিন থাকার জায়গা পেলেই আমার যথেষ্ট।

বাড়িওলাকে ছ'মাসের ভাড়া আমাকে শোধ করতে হল। লোকটা গণ্ডগোল শুরু করেছিল। টাকাপয়সা খরচ হল বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা থাকার জায়গা পেয়ে বড় খুশি লাগল। দমদমের নরক থেকে তো দূরে আছি।

জ্যোতিষ নরেনবাবু কিন্তু মাস দুয়েক আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মাসখানেকের মধ্যে বাসস্থানের পরিবর্তন।

লোকটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

সারাদিন প্রায়ই কাজ থাকে না। রান্নাবান্না করি, খাই। দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলের দিকে নরেনবাবু কিংবা পাঁচুদার ওখানে যাই। বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। নিরালা, নির্জন সময় কাটে। বেঁচে থাকার অর্থ নেই।

এ বাড়ির দোতলা থেকে প্রায়ই একটা মেয়েকে নামতে উঠতে দেখি। চেহারাটা বেশ। বিয়ের বয়স হয়েছে তো বটেই, একটু বেশিই হয়েছে বুঝি। মাথায় সিঁদুর দেখি না। খুব সাজগোজ করে অফিসে যায়। তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও কেউ আসে না বড় একটা। মেয়েটা আমার মতোই একা কি?

ভেবে ভেবে একটু কেমন হয়ে গেল মনটা, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে আমার মেয়েদের সম্পর্কে বাঙালিসুলভ লজ্জা-সঙ্কোচ হয় না। আবার কাউকে দুদিন দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্বলতাও নেই আমার। বরং মেয়েদের ব্যাপারে আমি এখন অতিশয় হিসেবি।

নীচের তলায় পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বড় একটা ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। অল্প ক' দিনেই আমার সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেছে। তাঁর বউকে বউদি বলে ডাকি। মাঝেমধ্যে মাংস বা মাছ পাঠিয়ে দেন, কফি করে ডেকে নিয়ে খাওয়ান। দুজনেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম মধু মল্লিক। নিজের কাজে তাঁর বেশ সুনাম আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান অনেকবার ঘুরে এসেছেন। নিজের কাজকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। আর সেই কারণেই তাঁকে অনবরত বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। গত কয়েক মাসে দেখলাম, মধু মল্লিক একবার দিল্লি-বম্বে, একবার অরুণাচল প্রদেশ একবার ওড়িশা ঘুরে এলেন। তা ছাড়া দিন-রাত অফিসের গাড়িতে শহর চক্কর মারা তো আছেই। বলেন—ভাই, এই চাকরি করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে দুদিন ঘরে থাকতে হলে হাঁপিয়ে পড়ি। তাই ভয় হয়, রিটায়ার করলে এক হপ্তাও বাঁচব না।

বউদি সারাদিনই প্রায় একা। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে যথাক্রমে চোদ্দো, বারো ও তিন বছরের। ছোটটি ছেলে, বড় দুটি মেয়ে। মেয়ে দুজন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে মডার্ন স্কুলে। নাচ গান শেখে, একজন ওরিগামি শেখে, অন্যজন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস করতে রামকৃষ্ণ মিশনে যায়। বেশ ব্যস্ত তারা। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বউদি খানিকটা নিঃসঙ্গ। আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসেন। বেশ একটা মা-মা ভাব তাঁর মধ্যে। মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা। মুখে সর্বদা পান আর হাসি।

সে যাকগে। বউদির একটা সময় কাটানোর শখ আছে। স্বামী খবরের কাগজের রিপোর্টার, বউ পাড়ার যাবতীয় খবরের সংবাদ সংস্থা। পরিচয় হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমি এ পাড়ার যাবতীয় খবর জেনে গেছি। তার মধ্যে একটা খবরই কেবল বউদি ভাল করে জানেন না। সে হল ওপর তলার ওই মেয়েটির খবর।

দুঃখ করে বললেন—অলকার বড্ড ডাঁট, বুঝলেন। অসীমবাবুরা যেমন সোশ্যাল মানুষ ছিলেন, বোনটি ঠিক তেমন আনসোশ্যাল। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজেকে নিয়ে ওরকম থাকে কী

করে?

আমি বললাম—নিশ্চয়ই একা থাকতে ভালবাসে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

বউদি হেসে বলেন—আপনি বিদেশে ছিলেন বলেই মেয়েদের একা থাকায় দোষ দেখেন না।

সে অবশ্য ঠিক। আমাকে স্বীকার করতে হয়।

বউদি বললেন—একা কি আর সাধ করে আছে! স্বামী নেয় না, সে এক কথা। আবার শুনি মা-বাপের সঙ্গেও বনিবনা নেই।

—দেখতে কিন্তু বেশ।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাকটা চাপা। রংও এমন কিছু ফরসা নয়।

হাসলাম। মেয়েদের ওই এক দোষ। কাউকে সুন্দর দেখতে চায় না। একটু না একটু খুঁত বের করবেই।

বউদি বললেন—ওকে যে কেন সবাই এত সুন্দর দেখে বুঝি না। আমাদের কর্তাটিও প্রথম ওকে দেখে মূর্ছা যেতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মেয়েটি কেমন?

বউদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—ভাল আর কী! এসব মেয়েরা আর কত ভাল হবে? তবু মিথ্যে কথা বলব না। এ বাড়িতে তেমন কিছু দেখিনি ওর। একা একা চুপচাপ থাকে। কারও দিকে লক্ষ করে না। বরং তিনতলার অবাঙালি পরিবারটা ভীষণ বাজে।

তবু অলকা সম্পর্কে খুব বেশি জানা গেল না। ওর স্বামী কে, কেন তার সঙ্গে ওর বনিবনা নেই, সে সব জানা থাকলে বেশ হত।

মধু মল্লিক একদিন জিজ্ঞেস করেন—ও মশাই, চাকরি-বাকরি চান না কি কিছু? আপনার তো বিদেশের টেকনোলজি জানা আছে।

আমি বললাম—কারখানার চাকরি করা আর পোষাবে না। ব্যবসা কিছু করতে পারি।

উনি তখন বললেন—জার্নালিজম করবেন? আপাতত একটা ফিচার লেখার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

রাজি হলাম। টাকার জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্য। গোটা দুই ফিচার লেখার বরাত পেয়ে ক'দিন বেশ ছোটাছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। প্রথম ফিচারটা ছিল কলকাতার হোটেলের ব্যবসার ওপর, দ্বিতীয় ফিচার ছিল যে সব ইন্ডাস্ট্রি এদেশে নেই সেগুলোর ওপর।

প্রথম ফিচারটির মালমশলা সংগ্রহ করতে সারা কলকাতা চার-পাঁচদিন দাবড়ে বেড়াতে হল। তারপর একদিন বসে মধু মল্লিকের টাইপরাইটার নিয়ে এসে লেখা শুরু করলাম। গরম পড়েছে বড্ড। পাখা চালিয়ে ঘরের দরজা খুলে হাট করে বসে কাজ করছি, এমন সময়ে, একজন বেশ লম্বা চওড়া লোককে ওপরতলায় উঠতে দেখলাম। প্রথমটায় কিছু সন্দেহ হয়নি, কিন্তু একটু বাদেই বউদি এসে এক কাপ চা রেখে বললেন—ভাই প্রভাসবাবু, একটু আগে একটা লোক—বেশ সুন্দর চেহারা, অলকার ঘরে ঢুকেছে।

আমি বললাম—ভাই-টাই কেউ হবে।

—না মশাই, ভাই-টাই নয়।

—তবে?

—সেইটেই রহস্য।

—ওর স্বামী নয় তো?

—না না, স্বামীদের হাবভাব অন্যরকম। এ লোকটাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। প্রেমে পড়েছে এমন চেহারা।

—যে খুশি হোগ গে। আমি অবহেলাভরে বললাম।

বউদি বিরসমুখে বললেন—ভাবসাব ভাল নয়। একা অসহায় পেয়ে মেয়েটাকে যদি কিছু করে! আমাদের কর্তা থাকলে ঠিক ইন্টারফিয়ার করত। ওর খুব সাহস।

আমি পাত্তা দিলাম না। বউদি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে লেখাটা তৈরি করছিলাম।

প্রথম ফিচার বেরোবে খবরের কাগজে, একটু যত্ন নিয়ে কাজ করাই ভাল।

দুপুর বেলায় যখন খাচ্ছি, তখন বউদি এসে শেষতম বুলেটিন দিলেন—লোকটা এখনও নীচে নামেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাতে কী?

বউদি হঠাৎ লাজুক স্বরে বললেন—ওপরতলায় একটা হুটোপাটির আওয়াজও পাচ্ছি।

আমি টেলিফোন তুলে নম্বরটা ডায়াল করলাম। বউদি অবাক হয়ে দেখছিলেন। তারপর হেসে কুটিপাটি।

অলকা

লন্ড্রিওয়ালা আমার একটি শাড়ি হারিয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ। লন্ড্রিওয়ালা অবশ্য বলেছে—পাওয়া যাবে, ভাববেন না। কিন্তু আমার ভরসা নেই। আজ সকালে গিয়ে লোকটাকে খুব বকাবকি করেছিলাম। প্রথমটা তেমন রা করেনি। তারপর হঠাৎ কথার পিঠে কথা বলতে শুরু করল। বলল—সব লন্ড্রিতেই ওরকম হয়। আমাদের নিয়ম যা আছে, ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ ত্রিশ টাকা। আমি ক্ষতিপূরণ নিয়ে যেতে পারেন।

আমি অবাক, বলে কী! ধোলাই তো মোটে তিন টাকার, তার দশগুণ হয় ত্রিশ টাকা। কিন্তু আমার চাঁদেরি শাড়িটার দাম পড়েছিল একশো নব্বই, জয়দেব একটা একজিবিশন থেকে কিনে দেয়। খুব বেশি শাড়িটাড়ি জয়দেব আমাকে কিনে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু যে কখানা কিনে দিয়েছিল তার কোনওটাই খেলো ছিল না। এ সব ব্যাপারে ওর রুচিবোধ ছিল দারুণ ভাল।

শাড়িটার জন্য রাগে-দুঃখে আমি পাগল-পাগল। বললাম—ইয়ার্কি করছেন নাকি? দুশো টাকার শাড়ির ক্ষতিপূরণ ত্রিশটাকা? আমি ক্ষতিপূরণ চাই না, শাড়ি খুঁজে দিন।

লন্ড্রিওয়ালাও মেজাজ দেখাল-হারানো শাড়ির দাম সবাই বাড়িয়ে বলে। ও সব আমাদের জানা আছে। যা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, শাড়ি পাওয়া যাবে না। যা করবার করতে পারেন, যান।

শেষের ওই 'যান' কথাটাই আমাকে ভীষণ অবাক আর কাহিল করে দিল। লন্ড্রিওয়ালা লোকটার চেহারা ভীষণ লম্বা, কালো, গুণ্ডার মতো, বয়সেও ছোকরা। কয়েকদিন কাচিয়েছি এ দোকানে, খুব একটা খারাপ ব্যবহার করেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, এই ইতর লোকটাই বুঝি দুনিয়ার সেরা শয়তান। আমারই বা কী করার আছে? কী অসহায় আমরা! 'যান' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রাগে, দুঃখে ফেটে পড়ে আমি বললাম—যান মানে! কেন যাব? আপনি যে কাপড়টা চুরি করে নেননি তার প্রমাণ কী? ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিলেই যদি অমন দামি একখানা কাপড় হাতিয়ে নেওয়া যায়—!

লোকটা বুক চিতিয়ে বলল—অ্যাঃ,দামি কাপড়! আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, বুঝলেন! দামি জিনিস অনেক দেখেছি, ফালতু পার্টি নই।

দোকানের দু-একজন কর্মচারী মালিকের পক্ষে সায় দিয়ে কথা বলছে। খুব অসহায় লাগছিল আমার। এ সময় একজন জোরালো পুরুষ-সঙ্গীর বড় দরকার হয় মেয়েদের।

একথা ভাবতে-না-ভাবতেই হঠাৎ যেন দৈববলে একজন ভদ্রলোক রাস্তা থেকে উঠে এলেন দোকানে। বেশ ভদ্র চেহারা, তবে কিছু রোগাভোগা। চোখেমুখেও বেশ দুঃখী বিনয়ী ভাব।

লোকটা দোকানে ঢুকে কয়েক পলক আমাকে দেখে নিয়ে মাথা নিচু করে বলল—ট্রাবলটা কী?

শোনাবার লোক পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। অবিরল ধারায় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে।

লোকটা শুনল। কথার মাঝখানে মাথাও নাড়ল! দোকানদার বাধা দিয়ে নিজের কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু লোকটা তাকে পাত্তা দিল না। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেটুনে একটা শ্বাস ফেলে বলল—হুঁ।

লোকটাকে আমার চেনা চেনা ঠেকছিল প্রথম থেকেই। কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু তখন শাড়ি হারানোর দুঃখ আর লন্ড্রিওয়ালার অপমানে মাথাটা গুলিয়ে ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

লোকটা লন্ড্রিওয়ালার দিকে একটু ঝুঁকে খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিস করে কী যেন বলল। লন্ড্রিওয়ালা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, দেখলাম।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি। কিছু শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন লন্ড্রিওয়ালার বন্ধু, আবার আমারও শুভানুধ্যায়ী।

খানিকক্ষণ ওইসব ফিসফাস কথাবার্তার পর হঠাৎ লন্ড্রিওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—দিদি, একটা শেষ কথা বলে দেব? আমি একশোটা টাকা দিতে পারি খুব জোর।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। যদিও আমার শাড়িটার দাম অনেক বেশি, তা হলেও সেটা তো অনেকদিন পরেছি। তা ছাড়া ত্রিশ টাকার জায়গায় একশো টাকা শুনে একটা চমক লেগে গেল। তবু বেজার মুখ করে বললাম—তাও অনেক কম। তবু ঠিক আছে।

লন্ড্রিওয়ালা টাকা নিয়ে কোনও গোলমাল করল না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রয়ার টেনে টাকা বের করে দিল। রসিদ সই করে দিলে লন্ড্রিওয়ালা লোকটিকে বলল—প্রভাসবাবু, আপনিও সাক্ষী হিসেবে একটা সই করে দিন।

লোকটা সই করলে আমি নামটা দেখলাম। প্রভাসরঞ্জন। কোনও পদবি লিখল না।

বেরিয়ে আসার সময় প্রভাসরঞ্জনও এল সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় কাঠফাটা রোদ। এই সকালের দিকেই সারা দিনের অসহনীয় গরমের আন্দাজ দিচ্ছে। আমি ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিলাম। এখন অফিস যাব, তাই ট্রাম রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার আগে প্রভাসবাবুকে বললাম—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি না এলে লোকটা টাকাটা দিত না।

প্রভাসবাবু মৃদু হেসে বললেন—আপনি কি টাকাটা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন?

আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। প্রশ্নটার মধ্যে একটু যেন খোঁচা আছে। বললাম—না। কেন বলুন তো!

—একটা শাড়ির সঙ্গে কত কী স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। শাড়ির দামটা তো বড় নয়।

আমি মৃদু হেসে বললাম—তাই। তা ছাড়া শাড়িটাও বড় ভাল ছিল।

প্রভাস মাথা নেড়ে বলেন—বুঝেছি। ও টাকা দিয়ে আর একটা ওরকম শাড়ি কিনবেন?

—কিনতে পারি। কিন্তু একরকম শাড়ি তো আর পাওয়া যায় না। দেখা যাক।

প্রভাসরঞ্জন আমার সঙ্গে ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন—শাড়িটা আপনাকে কে দিয়েছিল?

এবার আমি একটু বিরক্ত হই। গায়েপড়া লোক আমার দুচোখের বিষ। বললাম—ওটা আমার খুব পারসোনাল ব্যাপার।

প্রভাসরঞ্জন আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে বললেন—আমি অবশ্য আন্দাজ করতে পারি।

করেছিস না হয় একটু উপকার, তা বলে পিছু নেওয়ার কী? পুরুষগুলো এমন বোকা হয়, কী বলব! তবু ভদ্রতা তো আর আমাদের ছাড়ে না। আমার আবার ওই এক দোষ, সকলের সঙ্গে প্রশ্রয়ের একটু সুরে কথা বলে ফেলি। তা ছাড়া, লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর আন্দাজটা সত্যিই হতে পারে-বা।

বললাম—কী আন্দাজ করলেন?

প্রভাসরঞ্জন মৃদু স্বরে বললেন—আপনার স্বামী।

আমি একটু কেঁপে উঠলাম মনে মনে। কপালে বা সিঁথিতে আমি সিঁদুর দিই না। সম্পূর্ণ কুমারীর চেহারা আমার। তা ছাড়া যে এলাকায় আছি সেখানকার কেউ আমাকে চেনে না। এই লোকটা জানল কী করে যে আমার একজন স্বামী আছে?

এবার একটু কঠিন স্বরে কথা বলাটা একান্ত দরকার। লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

বললাম—আমার স্বামীর খবর আপনাকে কে দিল? আমার স্বামী-টামী কেউ নেই।

লোকটা অবাক হয়ে বলে—নেই! তা হলে তো আমার আন্দাজ ভুল হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ! এরকম অকারণ আন্দাজ করে করে আর সময় নষ্ট করবেন না। পুরুষমানুষদের কত কাজ

থাকে। পরের ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামায়।

প্রভাসরঞ্জন কিন্তু অপমান বোধ করলেন না। বড্ড গরম আর রোদে ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। একটা টার্কিশ রুমালে ঘাড় গলা মুছলেন। পরনে একটা পাজামা আর নীল শার্ট। শার্টের কাটছাঁট বিদেশি। বাঁ হাতে বড়সড় দামি ঘড়ি। চেহারা দেখে সচ্ছল মনে হয়।

অপমান গায়ে না মেখে প্রভাসরঞ্জন বললেন—আমি আপনার ফ্ল্যাটের নীচের তলায় থাকি। আপনি তো ঠিক চিনবেন না আমাকে। পাঁচুবাবু নামে যে বুড়ো ভদ্রলোক হাসপাতালে গেছেন আমি তাঁরই ফ্ল্যাটে—

আমি হাসলাম। বললাম—ও, ভালই তো। আমি অবশ্য ও বাড়ির কারও সঙ্গে বড় একটা মিশি না।

—ভুল করেন।

—কেন?

—মেশেন না বলেই আপনাকে নিয়ে লোক খুব চিন্তা-ভাবনা করে, নানা গুজব রটায়।

আমি তা জানি। রটাবেই, বাঙালির স্বভাব যাবে কোথায়? বললাম—আমি ভুল করি না, ঠিকই করি। ওদের সঙ্গে মিশতে রুচিতে বাধে।

প্রভাসরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—সেটা হয়তো ঠিকই। তবে আমি অন্য ধাতুতে গড়া, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

উনি কার সঙ্গে মিশেছেন, কেন মিশেছেন সে সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। পার্ক সার্কাসের ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে আমি সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে পার্কের দিকে চেয়ে থাকি। একটা কাক বুঝি ডানা ভেঙে কোনও খন্দে পড়েছে, তাকে ঘিরে হাজারটা কাকের চেঁচামেচি। কান ঝালাপালা করে দিল। তবু কাকের মতো এত সামাজিক পাখি আর দেখিনি। ওদের একজনের কিছু হলে সবাই দল বেঁধে দুঃখ জানাতে আসে। মানুষের মধ্যে কাকের এই ভালটুকুও নেই।

ট্রামের কোনও শব্দ পাচ্ছি না। বললাম—তাই নাকি?

এই 'তাই নাকি' কথাটা এত দেরি করে বললাম যে প্রভাসরঞ্জন একটু অবাক হয়ে বললেন—কিছু বললেন?

আমি বললাম—কিছু না।

প্রভাসরঞ্জন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। রোদ, গরম সব উপেক্ষা করে। আজকাল প্রায়ই পুরুষেরা আমার প্রেমে পড়ে যায়। এঁর সম্পর্কেও আমার সে ভয় হচ্ছে। বেচারা!

একটু ভদ্রতা করে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম—লন্ড্রিওয়ালা কি আপনার চেনা?

—না তো। বলে ফের বিস্ময় দেখালেন উনি।

আমি বলি—আপনার কথায় লোকটা তা হলে ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেল কেন?

—ওঃ! সেও এক মজা। ওর দোকানে আমিও কাচাতে-টাচাতে দিই, সেই সুবাদে একটু চেনা। একবার একটি প্যান্টের পকেটে ভুলে আমার পাসপোর্টটা চলে গিয়েছিল। সেইটে দেখে ও হঠাৎ আমাকে সমীহ করতে শুরু করে।

—পাসপোর্ট! আপনি বিদেশে ছিলেন নাকি?

—এখনও কি নেই? গোটা পৃথিবীটাই আমার বিদেশ।

ট্রাম কেন এখনও আসছে না এই ভেবে আমি কিছু অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল, এ লোকটা পাগল। এর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে থাকি ভাবতেও খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

প্রভাসরঞ্জন হাতের মস্ত ঘড়িটা দেখে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—আপনার ট্রাম তো এখনও এল না। অফিস ক'টায়?

আমি বললাম—দশটায়। তবে দশ-পনেরো মিনিট দেরি করলে কিছু হবে না।

ব্যথিত হয়ে প্রভাসরঞ্জন বলল—ওটা ঠিক নয়। দশ-পনেরো মিনিট দেরি যে কী ভীষণ হতে পারে।

আমি হেসে বললাম—কী আর হবে! সকলেরই একটু দেরি হয়। ট্রাম বাসে সময়মতো ওঠাও তো মুশকিল।

হুঁ। প্রভাসরঞ্জন বললেন—তার মানে কোথাও কেউ একজন দেরি করছে, সেই থেকেই দেরিটা

সকলের মধ্যেই চারিয়ে যাচ্ছে। ধরুন একজন স্টার্টার বাস ছাড়তে দেরি করল, ড্রাইভারও একটা পান খেতে গিয়ে দু মিনিট পিছোল, বাস দেরি করে ছাড়ল, সেই বাস-ভর্তি অফিসের লোকেরও হয়ে গেল দেরি। এই রকম আর কী। একজনের দেরি দেখেই অন্যেরা দেরি করা শিখে নেয়।

আমি হাসছিলাম।

উনি বললেন—কী করে অবস্থাটা পালটে দেওয়া যায় বলুন তো।

—পালটানো যায় না। ওই বুঝি আমার ট্রাম এল—

—হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভিড়, উঠতে পারবেন না।

ভিড় ঠিকই। ট্রাম বাসের একটু দেরি হলেই প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে আমার অভ্যাস আছে।

—চলি। বলেই ট্রামের দিকেই এগোই।

প্রভাসরঞ্জন হঠাৎ আমার পিছন থেকে অনুচ্চ স্বরে বললেন—সেদিন দুপুরে কে একটা লোক আপনার ঘরে ঢুকেছিল বলুন তো, আপনার স্বামী।

কথাটা শুনে আমি আর ঘাড় ফেরালাম না; শুনিনি ভান করে ভিড়ের ট্রামে ধাক্কাধাক্কি করে উঠে গেলাম ঠিক।

আমার কোনওদিনই তেমন ঘাম হয় না, ইসিনোফিলিয়া আছে বলে প্রায় সময়ই বরং আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শীত করে ওঠে। কিন্তু আজ আমি অবিরল ঘামছিলাম। সারাদিন বড় বেশি অন্যমনস্কও রইলাম আমি। মনে হচ্ছে, লন্ড্রিতে ওই লোকটার আসা, গায়ে পড়ে উপকার করা আর তার পরের এত সব সংলাপ এ সবই আগে থেকে প্ল্যান করে করা। এতদিন আমার জীবনটা যত নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন ছিল এখন যে আর ততটা নয় তা বুঝতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরা বা এই লোকটা অন্তত আমার বিয়ের খবর রাখে।

সাতদিন কেটে গেছে, প্রভাসরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় বা নামবার মুখে পাঁচুবাবুর বাইরের ঘরে থেকে খুব টাইপ রাইটারের আওয়াজ পাই। দরজা ভেজানো থাকে, কাউকে দেখা যায় না। আমিও তো আমার সিঁড়ির গোড়ায় বেশিক্ষণ থাকি না। বরং ভূতের ভয়ে কোনও জায়গা দিয়ে যেতে যেমন গা ছমছম করে, তেমনি একটা ভাব টের পাই। তাই সিঁড়ির মুখটা খুব হালকা দ্রুত পায়ে পেরিয়ে পক্ষিণীর মতো উড়ে যাই।

আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি আজকাল। বাইরের দরজাটায় সব সময় ল্যাচকিতে চাবি দিয়ে রাখি। স্পাই হোল দিয়ে না দেখে আর নাম ধাম জিজ্ঞেস না করে বড় একটা দরজা খুলি না। অবশ্য আমার ঘরে আসবেই-বা কে?

একদিন আমার দাদা অভিজিৎ এল। সে বরাবর রোগা দুর্বল যুবক, শীত গ্রীষ্মে গলায় একটা সুতির কম্ফর্টার থাকবেই। ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে পারে না, সারা বছর তার সর্দি থাকে। ডাক্তার বলেছে এ রোগ সারার নয়।

সকালবেলায় দাদা এসে ঘরে পা দিয়েই ঝগড়া শুরু করল—এ তুই শুরু করেছিস কী বল তো! আমাদের পরিবারটা মডার্ন বটে, কিন্তু তুই যে সব লিমিট ছাড়িয়ে গেলি!

রাগ করে বললাম—ও কথা বলছিস কেন? একা থাকি বলে যত খারাপ সন্দেহ, না?

—বটেই তো। জয়দেবের সঙ্গে না থাকিস আমরা তো রয়েছি। এ দেশের সমাজে একা থাকে কোন মেয়ে?

—আমি থাকব।

—না, থাকবি না। তোর ঝাটি-পাটি যা আছে গুছিয়ে নে, আমি ট্যাকসি ডাকি।

নিজের বাড়ির কোনও লোককেই আজকাল আমার সহ্য হয় না। ওরা আমাকে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতে শেখায়নি। সেটা আজকাল আমি বড় টের পাই। চারদিকে যখন স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দেখি তখনই আমার মনে হয়, আমারই যেন কী একটা ছিল না, হয়তো সইবার শক্তি বহনের ক্ষমতা, যা না থাকলে বিবাহিত জীবন বলে কিছু হয় না।

আমি দাদার জন্য চা করতে গিয়ে মনটাকে শক্ত করলাম খুব।

ফিরে এসে বললাম—জয়দেব বা আর কারও সঙ্গে আমি থাকব না।

—জয়দেবেরই বা দোষটা কী?

—যাই হোক। সব কি তোকে বলতে হবে নাকি?

কথায় কথায় ঝগড়া লেগে গেল। দাদা খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। এই সময় ফোনটা আবার বাজল। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার কানে তুলতেই সেই ধীর গম্ভীর গলায় বলল—আপনার ঘরে লোকটা কে?

আমি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম আসুন না প্রভাসবাবু একটু হেলপ করবেন। এ লোকটা আমার দাদা, বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

টেলিফোনে গলাটা শুনেই আজ আমি লোকটাকে চিনে ফেলেছি। কথা কটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশে হাসি শোনা গেল। প্রভাসরঞ্জন বললেন—বড্ড মুশকিল হল দেখছি! চিনে ফেললেন! দাদা কী বলছেন?

—ফিরে যেতে।

—তাই যান না। জয়দেববাবুর তো কোনও দোষ নেই।

—আপনি সেটা জানলেন কী করে?

—খোঁজ নিয়েছি। ইনফ্যাক্ট আমি জয়দেববাবুর সঙ্গেও দেখা করেছি ক'দিন আগে।

—মিথ্যে কথা।

—না, মিথ্যে নয়। আমি এখন একটা ডেইলি নিউজ পেপারের স্পেশাল রিপোর্টার। মধু মল্লিক যে কাগজে কাজ করেন।

—তাতে কী?

—সেই কাগজের তরফ থেকে স্মল স্কেল আর কটেজ ইন্ডাস্ট্রির একটা সার্ভে করেছিলাম। জয়দেববাবু ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক।

—আমার কথা উঠল কী করে?

—উঠে পড়ল কথায় কথায়।

দাদা এসে এ ঘরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফোনের কথা শুনছে। একবার চোখের ইশারা করে জিজ্ঞেস করল—কে?

আমি হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে ফোনে বললাম—না, আপনিই আমার কথা তুলেছিলেন।

—তাই না হয় হল, ক্ষতি কী?

—ক্ষতি অনেক। তার আগে বলুন, আপনার এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট কেন?

প্রভাসরঞ্জন কিছু গাঢ় গলায় ইংরিজিতে বললেন—বিকজ আই হ্যাভ অলসো লস্ট সাম অফ মাই হিউম্যান পজেশনস।

ফোন কেটে গেল।

দাদা বলল—কে রে?

—একজন চেনা লোক।

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল—চেনা লোক! বাঃ, বেশ। চেনার পরিধি এখন পুরুষমহলে বাড়ছে তা হলে।

আমি ছোট্ট করে বললাম—বাড়লে তোর কী?

—আমার অনেক কিছু। সে থাকগে, একি লোকটা তোকে কী বলছিল?

আমি হঠাৎ আক্রোশে রাগে প্রায় ফেটে পড়ে বললাম—তোরা কেউ কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না!

দরজার কাছ থেকে প্রভাসরঞ্জন বললেন—শান্তিতে কি এখনই আছেন? যান তো, একটু চা করে এনে খাওয়ান।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম লোকটার সাহস দেখে।

পাঁচুদাকে দেখেই বুঝি যে লোকটার হয়ে গেছে। ব্যাচেলার মানুষ আত্মীয়স্বজন বলতেও কাছের জন কেউ নেই, মরলে কেউ বুক চাপড়াবে না, অনাথা বা অনাথ হবে না কেউ। সেই একটা সান্ত্বনা। তবু একটা মানুষ ছিল, আর থাকবে না এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। বলতে কি পাঁচুদার জন্য বেশ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম।

ব্যাচেলারদের বেশি বয়েসে কিছু-না-কিছু বাতিক হয়ই। সম্ভবত কামের অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি মিলেমিশে তাদের বায়ুগ্রস্ত করে তোলে। পাঁচুদারও তা-ই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছ থেকে পয়সাকড়ি বা জিনিসপত্র হাতিয়েছে। ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী জ্যোতিষেরাও কাজ গুছিয়েছে কম নয়। পাঁচুদা কয়েকবারই জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসাতে নেমে ঠকে এসেছেন। তাঁর বাপের কিছু টাকাও তিনি পেয়েছিলেন, চাকরির বেতন তো ছিলই, সব মিলেই বেশ শাঁসালো খদ্দের। লোকে ঠকাবে না কেন? প্রতি বছর মাসখানেক ধরে তীর্থ ভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। শেষ বয়সটায় বেশ কষ্ট পেলেন।

আমার মধ্যে একটা পাপবোধ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় যখন প্রচণ্ড অভাবের সময় চলছিল তখন এই পাঁচুদা বেশ কয়েকবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের একটা মতলববাজ মনোভাব জন্মায়। পাঁচুদা মানেই হচ্ছে আদায়ের জায়গা। তাই পাঁচুদা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা খুশি হতাম, যখন-তখন তাঁর বাসা বা অফিসে গিয়ে নানা কাঁদুনি গেয়ে পয়সা আদায় করেছি। আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি তিনিই দেন। আর, আমি তাঁর একটা সোনার বোতাম চুরি করেছিলাম।

এসব কথা তাঁকে আর বলার মানে হয় না। তবু যখন শ্যামবাজারে আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে এক কঙ্কালসার চেহারাকে দেখি তখনই সেইসব পাপের কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নিজেকেই বলি—প্রভাসরঞ্জন, পাপের কথা স্বীকার করে নাও, খ্রিস্টানরা যেমন যাজকদের কাছে করে।

আমার কথা শুনে পাঁচুদা হেসে বললেন—যা যা জ্যাঠা ছেলে, চুরি করেছিস বেশ করেছিস। সেই চুরির বোতাম আজ তোকে দান করে দিলাম, যা।

ক্যানসারের কষ্ট তো কম নয়। শরীর শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে প্রতিনিয়ত। কিছু খেতে পারেন না। যা খান তা উঠে আসে ভেতর থেকে। ক্রমশ শরীর ছেড়ে যাচ্ছে তাঁর সব শক্তি। এখন কঙ্কালসার হাতখানা তুলতেও তাঁর বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে দেখি বুকের কম্বলটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদেন। সে কান্নাও অতি ক্ষীণ। যেমন পাঁজরের খাঁচা থেকে এক বন্দি ভোমরার গুঞ্জনধ্বনি উঠে আসে।

পত্রিকা অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই নানা জায়গায় পাঠায়। আর দু-এক মাসের মধ্যেই আমাকে পাকা চাকরিতে নেওয়া হবে। সাংবাদিকের এই চাকরি আমার খুব খারাপ লাগছে না। কিন্তু সব সময়ে একটা এই দুঃখ, আমি নানা দেশ ঘুরে যে প্রযুক্তি শিখেছি তা কোনও কাজে লাগল না। জীবনের দশ দশটা বছর আমি বৃথা অন্বেষণে কাটিয়ে এসেছি। আয়ুক্ষয়।

সুইজারল্যান্ডে আমাদের কারখানা দেখতে সেবার এক জাপানি প্রতিনিধি দল এল। বেঁটে বেঁটে চেহারার হাস্যমুখ, বুদ্ধির আলোজ্বলা ছোট ছোট চোখের মানুষ। প্রত্যেকেই বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তাদের দেশে। কারখানা দেখার অনুমতি চাইল। ওপরওয়ালা আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে ডেকে ওদের কারখানা দেখাতে বলে দিলেন। অনুমতি পেয়ে জাপানিদের চেহারা ধাঁ করে পালটে গেল। পরনের স্যুট খুলে ওভারঅল পরে নিল সবাই, খাতা-পেনসিল-পেন-কম্পাস সাজিয়ে নিল। তারপর প্রতিটি যন্ত্র আর যন্ত্রাংশের মধ্যে ওরা কালিঝুলি মেখে ঢুকে যেতে লাগল। ভাল করে লাঞ্চ পর্যন্ত করল না। ভূতের মতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের সমস্ত রহস্য জেনে নিতে লাগল। পরপর সাত দিন একনাগাড়ে তার কারখানাটিকে জরিপ করতে লাগল। শেষ দিকে ওদের চলাফেরা, যন্ত্রের ব্যবহার এবং কথাবার্তা শুনে হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি এ কারখানায় এতকাল থেকেও যে সব রহস্য জানি না ওরা অল্প দিনেই তা সব জেনে গেছে।

জাপানিরা দেশে ফিরে যাওয়ার দু বছরের মধ্যে জাপান থেকেই বিশ্বের বাজারে কম্প্রেসর মেশিন

ছাড়া হল। সুইস কম্প্রেসরের চেয়ে তা কোনও অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং দামে অনেক সস্তা। এমনকী ওরা সুইস যন্ত্রের নকল করেছে বলেও মনে করার কারণ নেই। যন্ত্রের মৌল রহস্যটা জেনে গিয়ে ওরা ওদের মতো যন্ত্র বানিয়েছে।

এ ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই একটি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার দল সুইজারল্যান্ড যায়। ব্যল-এ এসে তারা আমাদের কারখানাতেও হানা দিয়েছিল। স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকদের তুমিই এসকর্ট করে নিয়ে কারখানা দেখাও।

ভারতের লোক এসেছে শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করি। দলে একজন বাঙালিও ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি দেশে খুব বড় চাকরি করেন, আর আমি এ কারখানার একজন স্কিলড লেবার মাত্র। তাই তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করলেন না, একটু আলগা আলগা ভালবাসা দেখালেন। মোট ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা অত বড় কারখানাটার হাজারো যন্ত্রপাতি দেখে ফেললেন। যা-ই দেখাই তা-ই দেখেই বলেন—ওঃ, ভেরি গুড! হাউ নাইস! ইস ইট! যন্ত্রপাতি তাঁরা ছুঁয়েও দেখলেন না। তারপর ম্যানেজারের ঘরে বসে কফি খেয়ে চলে গেলেন। পরে স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—তোমার দেশের লোকেরা এত অল্প সময়ে এত বড় প্রোজেক্টের সব বুঝে ফেলল?

তখন আমি ঠিক করেছিলাম এরা যা করেনি তা আমাকেই করতে হবে। তারপর কিছুদিন আমি একা একা পুরো যন্ত্রপাতির নকশা কপি করতে শুরু করি। এমনিতেই ভূতের মতো খাটুনি ছিল, তার ওপর বাড়তি খাটুনি যোগ হল। হয়তো পেরেও যেতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার ভিতরকার সব উৎসাহ নিভে যায়। তবু যা শিখেছিলাম, যা কপি করেছিলাম তাও বড় কম নয়। যে-কোনও ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে আমার প্রযুক্তির ধারণা অনেক প্রশস্ত এবং বাস্তব। আমি হাতে-কলমে যন্ত্র চালিয়েছি। যন্ত্রের সব চরিত্রই আমার জানা। এখনও ভারী কম্প্রেসর মেশিনের যে-কোনও কারখানায় আমার অভিজ্ঞতা অসম্ভব রকমের কার্যকর হতে পারে।

কিন্তু তা হল না। আমি এখন নানা চটুল বা রাশভারী বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে ফিচার লিখছি। লিখতে আমার খারাপ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়েই আমার অধীত বিদ্যার অপচয়ের জন্য কষ্ট হয়, যা কষ্ট করে শিখে এসেছি তা এ দেশে কাজে লাগল না। অবশ্য আমি এখানকার কলকারখানায় চাকরি করতে আর উৎসাহীও নই। আমি চেয়েছিলাম নিজেই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করব।

এখন টাইপ রাইটারের খটখটানির মধ্যে একরকমের নতুন জীবনের খবর পেয়ে যাচ্ছি। মধু মল্লিক এসে প্রায়ই খবর দেন, আমার ফিচারগুলো কাজের হচ্ছে।

মধু মল্লিক একদিন এসে বললেন—কস্ট অফ প্রোডাকশন কমিয়ে আনার ব্যাপারে আপনার ফিচারটা সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। কিন্তু প্রভাসভাবু, আমাদের সবচেয়ে বেশি কটেজ আর স্মল স্কেল। শুধু হেভি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এদেশের ইনকাম স্টেবল করা যাবে না। আপনি কি এ কথা মানেন?

আমি মানি। মধু মল্লিকও মানেন দেখে খুব খুশি হলাম। বললাম—কটেজ বা স্মল স্কেল না থাকলে দেশের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায় এ আমি স্বীকার করি। তা ছাড়া এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক ওইসব নিয়ে আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওটার খুবই দরকার।

—লিখুন না একবার স্মল আর কটেজ নিয়ে। মধু মল্লিক বললেন। কাজ সহজ নয় তবে আমার অফিস থেকে প্রচুর সাহায্য করা হল এ ব্যাপারে। কুটির এবং ছোট ছোট শিল্পের ওপর পত্রিকা চারটে সিরিয়াল ছাপাবে। আমাকে সে জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার গাঁয়ে গঞ্জে চলে যেতে হল। সরকারি লোকদের সঙ্গে দেখা করা। সেই সূত্রেই জয়দেবের সঙ্গে দেখা বাঁকুড়ায়। ভারী দুঃখী চেহারার লোক এবং খুবই ভালমানুষ! ডক্টরেট হয়েছেন সম্প্রতি, জানেনও বিস্তর। একখানা নতুন বই লিখেছেন ফোক আর্ট সম্পর্কে। কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে আমি বলেছিলাম—আমার বউ-ছেলে সব পর হয়ে গেছে। সেই ভ্যাকুয়ামটা পূর্ণ করতে এখন আমার অনেক কাজ চাই। নইলে একা হলেই ভূতে পায়।

জয়দেব আমার হাত চেপে ধরে বললেন—আমার কেসও আপনার মতো। আমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু বউ ছিল। প্রায় বিনা কারণে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত। অলকার স্বামীকে যে এত সহজে দুম করে খুঁজে পাব কখনও ভাবিনি।

করল—ও কি আবার বিয়ে করবে?

—না, না।

—ওকে বলবেন, মেয়েদের দুবার বিয়ে হতে নেই। সেটা খুব খারাপ। ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের পরিবারে মস্ত ঝড়ের ধাক্কা গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কখনও সমাজ বা পরিবারের পারসপেকটিভে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবে না। যদি ভাবত তা হলে অলকা অত সহজে ছেড়ে যেতে পারত না। অপছন্দের স্বামীকেও মানিয়ে নিত। আর এও তো সত্যি যে, আজকের অপছন্দের লোক কালই প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে, যেমন আজকের প্রিয়জন হয়ে যায় কাল দুচোখের বিষ!

সত্যি কথা। সহ্য করা বা বহন করা আজকের মানুষের ধাতে নেই। অপছন্দের জিনিস তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করে দেয়। নতুন জিনিস নিয়ে আসে। আর এইভাবেই তাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে পিছল ও বিপজ্জনক।

আমি বললাম—আপনি কি এখনও অলকাকে ভালবাসেন?

কেমন একরকম লোভী শিশুর মতো তাকাল জয়দেব। অনেকক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বলল—তাতে কী যায় আসে! ও তো আর আমাকে ভালবাসে না!

আমি চিন্তা করে বললাম—দেখুন, ভালবাসাটা সব সময়েই তো আর হুস করে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো বেরোয় না। ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ভালবাসার চেষ্টা থেকেই ভালবাসা আসে।

—সে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টারও অভাব রয়েছে। তিলমাত্র মমতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে বিরাট ভালবাসা জন্মাতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই তিলমাত্রও নেই?

আমি ভাবিত হয়ে পড়ি। এবং ফিরে আসি।

কলকাতায় এসেই একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

একদিন অনেক রাত অবধি টাইপ মেশিন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। ভোররাতে এসে ঘুম ভাঙাল সুহাস।

দরজা খুলে তাকে দেখে খুব খুশি হই না, বললাম—কী রে, কী চাস?

—মার খুব অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। কী করব।

শরীরে একটা ধনুকের টংকার বেজে উঠল। মা!

কথা আসছিল না মুখে। অবশ হয়ে চেয়েছিলাম, সুহাস বলল—কিছু টাকা দাও।

—টাকা দেব? অবাক হয়ে বলি—টাকা দেব সেটা বড় কথা কী। আগে গিয়ে মাকে একটু দেখি! তুই ট্যাক্সি ডাক তো।

বলে আমি ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরছিলাম। সুহাস ট্যাক্সি আনতে যায়নি, দরজার কাছে দোনোমনো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তে বলল—তুমি বিশ্রাম নাও না! এক্ষুনি যাওয়ার দরকার নেই খুব একটা। অবস্থা যতটা খারাপ হয়েছিল ততটা এখন নয়। তুমি ব্যস্ত মানুষ, দু-চারদিন পরে যেয়ো।

ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না একদম। আবোল-তাবোল বকছে? এই বলল খারাপ অবস্থা, আবার বলছে তত খারাপ নয়। কেমন একটু সন্দেহ হল মনে। বললাম—তোর মুখে সত্যি কথা-টথা আসে তো ঠিক?

—বাঃ, মিথ্যে বলছি নাকি?

—মার অসুখ, তা আমাকে যেতে বারণ করছিস কেন?

—তোমার অসুবিধের কথা ভেবেই বলেছি। যাবে তো চলো।

—ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, আমি যাব।

দমদমের বাসার কাছে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি তখন সুহাস 'এই একটু আসছি' বলে কথায় কেটে পড়ল। বাড়িতে ঢুকে দেখি মা পিছনের বারান্দায় বসে কুলোয় রেশনের চাল বাছছে।

আমি গিয়ে মার কাছে বসতেই মা কুলো ফেলে আমাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে বলল, ওরা বলে তুই

নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস। কোনও এক বিধবা না সধবার সঙ্গে নাকি তোর বিয়ে সব ঠিক?

আমি স্তম্ভিত হয়ে মাকে দেখি। অনেকক্ষণ বাদে বলি—তোমার কী হয়েছে? শুনলাম তোমার খুব অসুখ!

—হলে বাঁচি বাবা। সে অসুখ যেন আর ভাল না হয়। কিন্তু গতরে তো অসুখও একটা করে না তেমন।

—সুহাস আজ সকালে গিয়ে তোমার অসুখের নাম করে টাকা চেয়েছিল।

মা হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে—ওর অবস্থা খুব খারাপ বাবা, নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই বোধহয় এই ফিকির করেছিল।

রান্নাঘর থেকে নিমি খুব হাসিমুখে এককাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল—দাদাকে কতদিন বাদে দেখলাম! খুব ব্যস্ত শুনি।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—সুহাস কোথায় গেল বউমা?

—এসে পড়বে এক্ষুনি। বসুন না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—ও আসবে না, আমি জানি। বউমা, তুমি মার কাপড়চোপড় যা আছে গুছিয়ে দাও। আমি মাকে নিয়ে যাব।

মা শুনে কেমন ধারা হয়ে গিয়ে বলল—সে কী কথা বলিস! এখন আমি কোথায় যাব?

আমি চড়া গলায় বললাম—যেতেই হবে। এখানে তোমার গুণের ছেলে তোমাকে ভাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে যে! কত বড় সাহস দেখেছ!

অমনি নিমি ঘর থেকে তেড়ে এসে বলল—বেশি বড় বড় কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। আপনার কীর্তিরও অনেক জানি।

দুচার কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে জুটতে লাগল চারদিকে।

আমি মাকে বললাম—মা, তোমাকে যেতেই হবে। এ নরকে আর নয়।

বোধহয় আমাকে ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতেই মা উঠে গিয়ে একটা টিনের তোরঙ্গ গুছিয়ে নিল। আমি মাকে নিয়ে চলে এলাম।

কয়েকদিন মন্দ গেল না। মা রান্না বান্না করে, আমি কাজে যাই। মধু মল্লিকের সবাই মার দেখাশুনা করে। এমনকী অলকা পর্যন্ত খোঁজ খবর নিয়ে যায়। কিন্তু এতসব ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া জানা পরিবেশে থেকে মার অভ্যাস নেই। সব সময় তটস্থ ভাব। মাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য আমার ছিল না, দিনরাত ঘুরি, রাত জেগে ফিচার টাইপ করি।

দিন পনেরো পরে মা একদিন মিনমিন করে বলল—প্রভাস, একবার বরং দমদম থেকে ঘুরে আসি।

গম্ভীর হয়ে বলি—কেন?

মা ভয় খেয়ে বলে—সুহাস আর নিমি যেমনই হোক ওদের ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

আমি বললাম—মা, সুহাস আর নিমি তোমার ওপর কেমন নির্যাতন করে বলো তো! মারে নাকি?

মা শ্বাস ফেলে বলে—অমানুষের সব দোষ থাকে বাবা। মাকে মারবে সে আর বেশি কথা কী?

—তবু যেতে চাও?

—ওদের কাছে যেতে চাইছি নাকি! ওই যে ছেলেমেয়েগুলো, ওরা যে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আমার জন্য কাঁদে।

—কাঁদবে না, অভ্যাস হয়ে যাবে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তুই একটা বিয়ে কর। তখন এসে পাকাপাকিভাবে তোর কাছে থাকব।

আমি বললাম—বাবার কাছে যাবে মা? চাও তো বন্দোবস্ত করে দিই।

—যাব বই কী! যাবখন। শীতটা আসুক।

বুঝলাম, এ জন্মের মতো সুহাসের হাত থেকে মার মুক্তি নেই। সুহাস যেমনই হোক, তার বংশধরেরা মার রক্তের স্রোত নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। আর ফেরানো যাবে না।

মাকে একদিন ফের গিয়ে দমদমের বাড়িতে রেখে এলাম।

এই ঝামেলায় আর জয়দেবের কথা তেমন মনে ছিল না। কাজের চাপও ক্রমশ বাড়ছে। হঠাৎ একদিন সাত সকালে জয়দেব নিজেই এসে হাজির।

অলকা

মেঘৈর্মেদুরম্বরম। কাল রাত থেকে বৃষ্টি ছাড়েনি। যেমন ভয়ঙ্কর তেজে কাল রাত ন'টায় বৃষ্টি এল প্রায় ঠিক তেমনি তেজে সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়ল। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, কলকাতা ভেসে যাবে।

একটা গোটা ফ্লাটে সম্পূর্ণ একা থাকতে আমার যে ভয়-ভয় করে তা মিথ্যে নয়। শোয়ার আগে বারবার দরজা জানালার ছিটকিনি দেখি, খাটের তলা, আলমারির পেছনে এবং আর যে সব জায়গায় চোর-বদমাশ লুকিয়ে থাকতে পারে তা ভাল করে না দেখে শুই না। ভূতের ভয় ছেলেবেলা থেকেই ছিল না, তবে বড় হওয়ার পর কখনও কখনও কী যেন একটা ভূত-ভূত ভয়ের ভাব হয়। বিশেষ করে যেদিন বৃষ্টি নামে। কাল সারা রাতের অঝোর বৃষ্টিতে বারবার জানালার শার্সিতে টোকা পড়েছে বৃষ্টির আঙুলে, দরজা ঠেলেছে উন্মত্ত বাতাস। ঝোড়ো বৃষ্টিতে কলকাতার ট্রামবাস ডুবে গেল বুঝি। শহরটা বোধহয় একতলা সমান জলের তলায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এমন বাদলা বহুকাল দেখিনি।

ঘুম ভেঙে একবার উঠে দেখি, রাত দুটো। শীত-শীত করছিল। বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ কেন গা ছমছম করল! একটু শিউরে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে বাতি না নিভিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালানো থাকায় ভয়-ভয় ভাবটা কমল বটে, কিন্তু ঘুম আসে না। কোনওখানে মানুষের জেগে থাকার কোনও শব্দ হচ্ছে না। কুকুরের ডাক, বেড়ালের আওয়াজ কিছু নেই। ঘনঘোর মেঘ ডেকে ওঠে কেবল, বৃষ্টির জোর বেড়ে যায়, চারিদিক লণ্ডভণ্ড হতে থাকে। শুয়ে থেকে বুঝতে পারছিলাম, পৃথিবীতে একা হওয়ার মধ্যে কোনও সুখ নেই। একা মানুষ বড় নিস্তেজ, মিয়োনো।

নরম বালিশ বারবার মাথার তাপে গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ উল্টে দিচ্ছি বারবার। বর্ষাকালের সোঁদা স্যাঁতা এক গন্ধ উঠেছে বিছানা থেকে। কিছুতেই রাত কাটছে না।

এইভাবে রাত আড়াইটেয় বড় অসহ্য হয়ে উঠে বসলাম। বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল কারও সঙ্গে একটু কথা বলতে, কারও কথা শুনতে। কিন্তু আমার তো তেমন কেউ নেই।

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। ব্যালকনির দিকে জানালার শার্সির পাল্লা আছে, অন্যগুলোয় কাঠের পাল্লা। শার্সিতে চোখ রেখে দেখি ভূতের দেশের অন্ধকার চারদিক। নীচের রাস্তায় পরপর আলোগুলোর মধ্যে দুটো মাত্র জ্বলছে এখনও। সেই আলোয় দেখা গেল, রাস্তায় হাঁটুজল। জলে প্রবল বৃষ্টির টগবগানি। আকাশ একবার দুবার চমকায়, গম্ভীর মেঘধ্বনি হয়। বড় একা লাগে।

আমার পরনে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পোশাক। গায়ে কেবল ব্লাউজ, পরনে সায়া। রাতে এত বেশি গায়ে রাখতে পারি না। ঘরের বাতি জ্বালা রেখে এ পোশাকে জানালায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক। কিন্তু ওই নিশুত রাতে কে আর দেখবে। আর মনটাও বড় অস্থির তখন। ঠাণ্ডা শার্সিতে গাল চেপে ধরে বিবশার মতো বাইরে তাকিয়ে থেকে থেকে আস্তে আস্তে জগৎসংসারের ওপর এক গভীর অভিমান জেগে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল—তোমাদের কাছে আমার আদর পাওনা ছিল। কেন তোমরা কেউ কখনও আমাকে ভালবাসলে না? বলো কেন...?

কখনও কেঁদেছি আপনভোলা হয়ে। কাঁদছি আর কাঁদছি। আর কাকে উদ্দেশ করে যেন বিড়বিড় করে বলছি—এবার একদিন বিষ খেয়ে মরব, দেখো।

এ কথা বিশেষ কারও উদ্দেশ করে বলা তা সঠিক আমিও জানি না। তবে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতে যখন চারদিকের সব নাগরিকতা মুছে গিয়ে অভ্যন্তরের বন্যতা বেরিয়ে আসে, যখন মনে হয় এইসব ঝড়বৃষ্টির মতো কোনও অঘটনের ভিতর দিয়েই আমাকে সৃষ্টি করেছিল কেউ, তখন আর কাউকে নয়,

কেবল এই জন্মের ওপরেই বড় অভিমান হয়।

একা, বড় একা।

শার্সির কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসি। সাজানো ঘর-দোর ফেলে অসীমদা কেন বিদেশে চলে গেছে তার পরিবার নিয়ে। হয়তো ফিরবে, হয়তো কোনওদিনই ফিরবে না। এই যে আলমারি, খাটপালঙ্ক, রেডিয়োগ্রাম, নষ্ট ফ্রিজ, টেলিফোন, এরা কারও অপেক্ষায় নেই, এরা কারও নয়। তবু মানুষ কত যত্নে এইসব জমিয়ে তোলে। কান্না পাচ্ছিল। টেলিফোনের সামনে বসে বিড়বিড় করে বললাম—কোনও মানুষকে জাগানো দরকার, আমাকে ভূতে পেয়েছে আজ রাতে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি বড় একা।

টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকি। কোনও বিশেষ নম্বর ধরে নয়, এমনি আবোল-তাবোল যে নম্বর মনে আসছে সেই ঘরে আঙুল দিয়ে ডিস্ক ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম। প্রথমবার অনেকক্ষণ ধরে রিং হল, কেউ ধরল না। আমার ভয় করছিল শেষ পর্যন্ত কেউ কি ফোন ধরবে না?

তৃতীয়বার রিং হতে দু মিনিট বাদে একটি মেয়ের ঘুম-গলা ভেসে এল—

—আমি অলকা।

—অলকা! কোন অলকা? এটা ফোর সিক্স ডবল থ্রি...

আমি বললাম—শুনুন, রং নাম্বার হয়নি, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

অবাক মেয়েটি বলল—কী কথা?

আমি বললাম—আপনার কে কে আছে? স্বামী।

—আমার বিয়ে হয়নি।

—মা? বাবা? ভাইবোন?

—বাবা আছেন। এক ভাই। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো! এত রাতে এসব কী প্রশ্ন?

—আমার বড় একা লাগছে। ভয় করছে। আপনার নাম কী?

ওপাশের মেয়েটি অবশ্যই খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে। অন্য কেউ হলে ফোন রেখে দিত। এ কিন্তু জবাব দিল। বলল—আমার নাম মায়া দাস।

—কী করেন?

—কলেজে পড়াই। কিন্তু আমার এখন খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনি কে বলুন তো!

—আমি অলকা। আমি একটা ফ্ল্যাটে একা থাকি। আজ রাতে বড় ঝড়-বাদল, আমার ভাল লাগছে না।

—সেই জন্য? আমার ফোন নম্বর আপনি জানলেন কী করে?

—জানি না তো! এখনও জানি না। আন্দাজে ছ'টা নম্বর ডায়াল করছিলাম, নম্বরগুলো মনেই নেই এখন। আপনি রাগ করলেন?

—না, রাগ নয়। আমাকে অনেক খাতা দেখতে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড।

—তা হলে ঘুমোন।

—শুনুন, আপনি আমার চেনা কেউ নন তো? ফোনে মজা করার জন্য পরিচয় গোপন রেখে...

—না না। সেসব নয়। আমি আসলে চাইছি, কিছু লোক আমার মতোই জেগে থাকুক আজকের রাতে। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমি ছাড়া সারা কলকাতায় বুঝি আর কেউ জেগে নেই।

ওপাশে বোধহয় মেয়েটির বাবা জেগে গেছেন। এক গম্ভীর পুরুষের স্বর শুনতে পেলাম—কে রে মায়া? কোনও অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

মায়া বোধহয় মাউথপিসে হাত চাপা দিল। কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তারপর মায়া বলল—আপনার নাম—ঠিকনা কিছু বলবেন?

—কেন?

—বাবা বলছেন, আপনার কোনও বিপদ ঘটে থাকলে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করতে পারি।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বিপদ কিছু নেই। শুধু ভয় আছে। ঘুম ভাঙালাম বলে কিছু মনে করবেন না।

—আমার বাবা ডি এস পি। কোনও ভয় করবেন না।

ঠিক এই সময়ে মায়ার বাবা ফোন তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো, আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

—পার্ক সার্কাস। খুব অসহায় গলায় বললাম।

—বাড়িতে একা আছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন, বাড়ির লোকজন কোথায় গেল?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমি একাই থাকি।

মায়ার বাবা একটু গলা ঝেড়ে বললেন—ও। বয়স কত?

—বেশি নয়। একুশ-বাইশ।

—কী করেন।

—একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি।

—ঠিকানাটা বলুন।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। নার্ভাসও লাগছে খুব। এতটা নাটক না করলেও হত। ঠিকানা দিলে ডি এস পি সাহেব হয়তো থানায় ফোন করে দেবেন, পুলিশ খোঁজ নিতে আসবে। কত কী হতে পারে!

ঝুঁকি না নিয়ে বললাম—কাকাবাবু, মাপ করবেন। অনেক বিরক্ত করেছি।

উনি বললেন—শুনুন, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোনও বিপদে পড়েছেন, কিন্তু বলতে সংকোচ করছেন। আমি অ্যাকটিভ পুলিশের লোক, নিঃসংকোচে বলতে পারেন। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

ওঁর এই সহৃদয়তা আমার ভাল লাগছিল। কিন্তু কী করব, আমার যে পুলিশের কোনও দরকার নেই। এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে আমি মানুষের জেগে-থাকার শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়তো এটা ভীষণ ছেলেমানুষি। এইভাবে ফোন করে লোককে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। তবু আর তো কোনও উপায় ছিল না।

ভদ্রলোক বারবার 'হ্যালো হ্যালো' করছেন সাড়া না পেয়ে। আমার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। আস্তে আস্তে বলতে হল—না কাকাবাবু, কোনও বিপদ নয়। কেবল ভয়। এখন ভয়টা কেটে গেছে। তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

বাকি রাতটা আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিতে দিতে বারবার ডি এস পি ভদ্রলোকের সাহায্য করা, প্রোটেক্ট করার কথাটা মনে পড়ছিল। আমাকে কেউ রক্ষা করুক, ত্রাণ করুক এ আমার অসহ্য। আমি কি অসহায়, অবলা?

ঠিক এই কারণেই প্রভাসরঞ্জন বাবুকে আমি পছন্দ করতে পারি না। যেমন অপছন্দ আমার সুকুমারকে। এমনকী উপরওয়ালার ভূমিকা নেওয়ার একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছিল বলেই বোধহয় জয়দেবকেও আমি নিতে পারিনি স্বামী হিসেবে। জয়দেবের অবশ্য আরও অনেকগুলো খাঁকতি ছিল।

সকালেও বৃষ্টি ছাড়েনি। এ বৃষ্টিতে ঝি আসবে না জানি। কাজেই সকালে উঠে ঘরদোর সারতে হল নিজেকেই। এক অসম্ভব একটানা প্রবল বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। আমার ফ্ল্যাট থেকে রাস্তার কোনও গাড়িঘোড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, নীচের হাঁটুজলে কিছু গরিব ঘরের ছেলে চেঁচাচ্ছে আর বল খেলছে। কয়েকবার রিকশার ঘন্টির শব্দ হল। কাদের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া আসছে ঘরে।

চালে-ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে জানালার ধারে বসি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে আসছে। বৃষ্টির তেজ এইমাত্র খানিকটা কমে গেল। ধরবে। অফিসে যাওয়াটা কি আজ ঠিক হবে? না গেলেও ভাল লাগে না। একা ঘরে সারাদিন। কী করি?

বেলা নটায় উঠে স্নান সেরে নিলাম। ভেজা চুল আজ আর শুকাবে না। কিন্তু রাতে ঘুম হয়নি, স্নান না করলে সারাদিন ঘুমঘুম ভাব থাকত। কিন্তু স্নান করেই বুঝলাম, হুট করে ঠাণ্ডা লেগে গেল। গলাটা ভার, চোখে জল আসছে, নাকে সুড়সুড়, তালুটা শুকনো-শুকনো। ছাতা হাতে অফিসে বেরোলাম তবু শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ির নীচেই প্রভাসরঞ্জন দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার জল দেখছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—যাবেন কী করে? যা জল।

—যেতে হবে যেমন করে হোক।

—ট্রাম-বাসও পাবেন না। দুটো-একটা যা চলছে তাতে অসম্ভব ভিড়। আমি একটু আগে বেরিয়ে দেখে এসেছি।

একটু ইতস্তত করছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে যদি ফিরে আসতে হয় তো যাওয়াও হল না, জল ভেঙে ঠাণ্ডাও লেগে গেল হয়তো।

প্রভাসরঞ্জন বললেন—খুব জরুরি কাজ নাকি?

—জরুরি। একটা ফাইল ক্যাবিনেটের চাবি আমার কাছে রয়ে গেছে।

—রেনি ডে-তে কি আর অফিসের কাজকর্ম হবে?

—হবে।

এই বলে রাস্তাঘাট একটু দেখে নিয়ে সত্যিই বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় পা দিতে-না-দিতেই একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে রোদ দেখা দিল। কী মিষ্টি রোদ! গোড়ালিডুবু জল ভেঙে, শাড়ি সামলে কষ্টে এগোতে থাকি। ঠাণ্ডা জলে পা দিতেই শরীর একটা শীতের কাঁপনি দিচ্ছে। দিক। গোটা দুই ট্যাবলেট খেয়ে নেব। ট্যাবলেট ক্যাপসুলের যুগে অত ভয়ের কিছু নেই।

ভাগ্য ভাল, ডিপোর কাছ বরাবর যেতে-না-যেতেই লেডিজ স্পেশাল পেয়ে পেলাম।

অফিসে এসেই বেয়ারাকে দিয়েই গোটা দশেক ট্যাবলেট আনিয়ে দুটো খেয়ে ফেললাম। তারপর চা। শরীরটা খারাপই লাগছে। সর্দি হবে।

গামবুট আর বর্ষাতিতে সেজে সুকুমার আজ বেশ দেরিতে অফিসে এল। ও আবার ম্যানেজমেন্টকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। অফিসে ঢুকেই ধরাচূড়া ছেড়ে সোজা আমার টেবিলের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল—দুটো সিনেমার টিকিট আছে। যাবে? ইংরিজি ছবি।

আমি ওর বিশাল স্বাস্থ্যের চেহারাটা দেখলাম খানিক। এর আগে ওর সঙ্গে কয়েকবারই সিনেমায় গেছি। তখন সংকোচ ছিল না। সেদিন আমার ফ্ল্যাটে সেই কাণ্ড ঘটানোর পর থেকে ও আর বড় একটা কাছে ঘেঁষেনি এতদিন। লজ্জায় লজ্জায় দূরে দূরে থাকত। আজ আবার মুখোমুখি হল।

বললাম—আজ শরীর ভাল নেই।

—কী হয়েছে?

—সর্দি।

—ওতে কিছু হবে না। চলো, ঠেসে মাংস খেয়ে নেবে। মাংস খেলে সর্দি জব্দ হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম—আর সুকুমার জব্দ হবে কীসে?

সুকুমার দু পলক আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ গলায় বলল—মাংসে। যদি সেই সঙ্গে হৃদয় পাওয়া যায় তো আরও ভাল।

একবার আক্রান্ত হওয়ার পর আমার সাহস কিছু বেড়েছে। বললাম—এত দাবিদাওয়া কীসের বলো তো! বেশ তো আছি। তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো।

—আমি আমার মতো নেই।

এটা অফিস, এসব কথাও বিপজ্জনক। তাই মুখ নিচু করে বললাম—এসব কথা থাক সুকুমার।

—থাক। তবে এসব কথা আবার উঠবে, মনে রেখো।

আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। পুরুষেরা অসম্ভব দখলদার এক জাত।

দুটো সিনেমার লাল টিকিট বের করে সুকুমার আমার সামনেই ছিঁড়ল কুটিকুটি করে। আমার টেবলের উপর ছেঁড়া টিকিটের টুকরো কাগজ জড়ো করে রেখে বলল—জানতাম তুমি যেতে চাইবে না। কিন্তু আমারও তো একটা সুযোগ দরকার।

অফিসে আজ কাজকর্মের মন্দা। লোকজন বেশি আসেনি। বেশ বেলা করে দু-চারজন এসেছে বটে, তবু বড্ড ফাঁকা ঠেকছে অফিস। নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে বাধা নেই। সত্যি বলতে কী, আমার কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল।

বললাম --সুযোগ মানে কিন্তু দখল করা নয়। আমি কারও সম্পত্তি হতে পারিনি, কোনওদিন পারবও না।

—তা হলে আমাকেই তোমার সম্পত্তি করে নাও না। চিরকাল তোমার হুকুমমতো চললেই তো হল।

হাসলাম। ছেলেমানুষ!

বললাম—ওরকম নেতানো নির্জীব পুরুষও মেয়েদের পছন্দ নয়।

—তা হলে কী হবে?

—কিছু হবে না।

—কীসের বাধা অলকা? তোমার স্বামীর কথা ভাবছ?

মাথা নেড়ে বললাম—না। তবে সেটাও ভাবা উচিত। এখনও তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়নি।

—করে নাও।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বললাম—সে অনেক ঝামেলা, দরকারও দেখি না। কিছুদিন গেলেই সে নিজেই মামলা করবে। আমি কোর্টে যাব না, এক্সপার্টি হয়ে ওকে ডিক্রি করে দেব।

—সেটা অনিশ্চিত ব্যবস্থা অলকা। উনি যদি মামলা না করেন?

—বয়ে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে—তুমি অত আলগা থেকো না। কেন নিজেকে নষ্ট করছ? আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি!

কী থেকে কী হয়ে গেল মনের মধ্যে।

মেঘভাঙা অপরূপ রোদের ঝরনা বয়ে যাচ্ছে চারদিকে। অফিসঘরে গনগন করছে আলোর আভা। দুদিন মনমরা বৃষ্টির পর কী ভাল এই রোদ্দুর। কাল রাতের সেই একা থাকা ভয়ংকর ছবি মিথ্যে মনে হয়। আবার সেই বাসায় আজকেও আমাকে একা ফিরে যেতে হবে। যদি রাতে বৃষ্টি আসে ফের, রাতে আবার ঘুম ভেঙে ভূতে-পাওয়া মাথা নিয়ে বসে থাকতে হবে।

হ্যাঁ, ঠিক। প্রোটেক্টার না হোক, আমার একজন সঙ্গী চাই। কাউকে না হলে বাঁচব কী করে?

সুকুমার দেখতে বেশ। তা ছাড়া বড় সরল, সোজা ছেলে! ও ওকে খারাপ লাগেনি। আজ অপরাহ্ণের আলোয় অফিসঘরে বসে মুখোমুখি ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ কী হয়ে গেল। ভাবলাম—কী হবে এত বাছবিচার করে! নিজেকে নিয়ে আর কত বেঁচে থাকা।

বললাম—শোনো সুকুমার, আমি ডির্ভোস চাই।

—চাও? ও লাফিয়ে ওঠে।

—চাই। আমার স্বামীও চায়। হয়তো ডিভোর্স পেতে কিছু সময় লাগবে।

—তারপর কী করবে অলকা?

—তারপর করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে সুকুমার। এক দুরন্ত অধৈর্য অনুভব করে বলি।

—অলকা, যদি আমরা এক্ষুনি বিয়ে করি, তা হলে?

আমি ক্ষণকাল চুপ করে থাকি। বুকের মধ্যে নানা ভয়, দ্বিধা, সংস্কার ছায়া ফেলে যায়।

তারপর বলি—কয়েকটা দিন সময় দাও।

—দিলাম। কতদিন বলো তো

—দেখি।

একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেল সুকুমারকে। একটু হয়তো কিন্তু রইল, দ্বিধা রইল, তবু ওটুকু কিছু নয়। সেসব দ্বিধা, ভয় ভেঙে সুকুমার ঠিক সাঁতরে আসবে কাছে।

রাতটা মাসির বাড়িতে গিয়ে কাটালাম। জ্বর এল রাতে। তিনটে দিন বাড়ির বার হওয়া গেল না। অল্প জ্বরেই কত যে ভুল বকলাম ঘোরের মধ্যে!

চারদিনের দিন ফের ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম। মাসি আজকাল আর আটকে রাখে না, যেতে চাইলে এককথায় ছেড়ে দেয়। ঢিলে বলগা মেয়েকে সকলেরই ভয়।

দোতলার ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা জানালা হাট করে খুলে বন্ধ বাতাস তাড়াই। ধুলো-ময়লা পরিষ্কার

করি। রবিবার। তাড়া নেই।

চায়ের জল চাপিয়ে এলোচুলের জট ছাড়াতে একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই।

কলিং বেল বাজল। এ সময়ে কেউ আসে না। একমাত্র সুকুমার আসতে পারে। তার তর সইছে না।

কাঁপা বুক নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেও সাপ দেখে পিছিয়ে আসার অবস্থা। চৌকাঠের ওপারে জয়দেব দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ কথা ফোটে না কারও মুখে। জয়দেবের চেহারা রোদে পোড়া, তামাটে, কিছু রোগা হয়েছে। মাথার চুল এত ছোট যেন মনে হয় কদিন আগে ন্যাড়া হয়েছে। পরনে ধুতি আর ক্রিমরঙা সুতির শার্ট। কিন্তু ধুতিটা এমনভাবে পরেছে যে মনে হয় পাশের ফ্ল্যাট থেকে এল। বাইরে বেরোবার পোশাক নয়।

চৌকাঠের বাইরে থেকে জয়দেব এক পাও ভিতরে আসার চেষ্টা করল না। দাঁড়িয়ে থেকে বলল—তুমি এখানে থাকো সে খবর সদ্য পেয়েছি।

—কী চাও?

খুব সাধারণ আলাপচারির গলায় জয়দেব বলল—কিছু চাই না অলকা। তোমার কাছে ডিভোর্সে মত দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তার কোনও উত্তর দাওনি। তোমার কি মত আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে বলি—দরজার বাইরে থেকে অত জোরে ওসব কথা বলছ কেন? ভিতরে এসো।

জয়দেব এল। কোনওদিকে তাকাল না, ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ করল না। খুবই কুণ্ঠিত পায়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল—আমি নীচের তলায় প্রভাসবাবুর বাসায় উঠেছি কাল এসে।

প্রভাসের সঙ্গে জয়দেবের চেনা আছে জানতাম। তাই চমকালাম না। দরজা বন্ধ করে এসে জয়দেবের মুখোমুখি বসে বললাম—আমি খুব তাড়াতাড়ি ডির্ভোস চাই।

জয়দেব মুখখানা করুণ করে বলল—তাড়াতাড়ি চাইলেই তো হয় না! কোর্ট থেকে এ সব কেসে বড় দেরি করে। তাড়াতাড়ি চাইলে আরও আগে জানালে না কেন? কবে কেস ফাইল করা যেত!

আমি মাথা নিচু করে বলি—শোনো, ডিভোর্স পেতে দেরি হোক বা না হোক, আমরা তো একটা এগ্রিমেন্টে আসতে পারি!

—কী এগ্রিমেন্ট?

—ধরো, আমরা কাউকে কোনও অবস্থাতেই দাবি করব না। পরস্পরের কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাব না।

—তার জন্য এগ্রিমেন্ট লাগে না অলকা। জয়দেব বলল—আমরা সেই রকমই আছি। কথার স্বর শুনেই বোঝা যায়, জয়দেবের মন এখন অনেক গভীর হয়েছে। জীবনে কোনও একটা সত্য বস্তুর সন্ধান না পেলে মানুষ এত গভীর থেকে কথা বলতে পারে না। তাই আমি ওর মুখের দিকে কয়েকবার তাকালাম। ও আমাকে দেখছিল না। চোখ তুলে দেওয়ালের মাঝারি উচ্চতায় চেয়েছিল। সেই অবস্থায় চেয়ে থেকেই বলল—তুমি একটি ছেলেকে পছন্দ করো শুনেছি। তাকে বিয়ে করার জন্যই কি এত তাড়া?

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি—না তো! আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

—সুকুমার না কী যেন নাম, শুনছিলাম। তোমার অফিসের।

—ওঃ! বাস্তবিক আমার সুকুমারের মুখটা এখন মনে পড়ল। বললাম—পছন্দ নয়। তবে ওই একরকম।

—ভাল।

—তুমি ডিভোর্স চাইছ কেন? বিয়ে করবে? বললাম।

ও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল—বিয়ে আর না। মুক্তি চাইছি, নইলে বড় কষ্ট হয়।

—কষ্ট কীসের?

—ওই একটা অধিকারবোধ থাকে তো পুরুষের। সেইটে মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। ডিভোর্স হয়ে গেলে একরকম শান্তি।

—ও।

—আচ্ছা—বলে জয়দেব কুণ্ঠিত পায়ে উঠল। উকিলের চিঠি দেব। তুমি কি অ্যালিমনি চাও?

—সেটা কী?

—খোরপোষ।

—না, না! চমকে উঠে বলি।

—আচ্ছা তা হলে—

—আচ্ছা। বললাম।

দরজা খুলে জয়দেব চলে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওর পায়ের শব্দ যখন নামছে তখন আমি ঘরের মধ্যে চুলের জটে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছি। কত ভাবনা! সে যেন এক আলো-আঁধারের মধ্যে ডুবে বসে থাকা। উঠলাম না, রাঁধলাম না, খেলাম না। শুধু বসে রইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ের আঙুল হৃৎপিণ্ডে টোকা মারল। নড়ে উঠল বুকের বাতাস। সচেতন ভীতগ্রস্ততায় টের পাই—আমি কাউকেই ভালবাসি না। কাউকে নয়। কেবলমাত্র নিজেকে। আমি কোনওদিন কাউকে ভালবাসতে পারব না।

কী করে বেঁচে থাকব আমি?

পৃথিবীতে কত দুর্যোগের বর্ষা নামবে কতবার! কত একা কাটবে দিন! কাউকে ভাল না বেসে আমি থাকব কী করে?

বিকেল কাটল। নীচের তলা থেকে অহঙ্কারী জয়দেব একবারও এল না খোঁজ করতে। সুকুমার টেলিফোনও করল না। বড় অভিমানে ভরে গেল বুক। সারাদিন খাইনি, স্নান করিনি, কে তার খোঁজ রাখে!

সন্ধে হল, রাত গড়িয়ে গেল গভীরের দিকে।

শরীর দুর্বল। মাথা ফাঁকা। মনটায় তদগত একটা আচ্ছন্নতা। ভূতে পেয়েছে আমাকে। উঠে গিয়ে ছারপোকা মারবার অমোঘ ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসলাম। চিরকুটে লিখে রাখলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

লিখে বিছানায় শুয়ে আস্তে শিশির মুখ খুলে ঠোঁটের কাছে এনে পৃথিবীকে বললাম—ভালবাসা ছাড়া কী করে বাঁচি বলো! বাঁচা যায়? ক্ষমা করো।

ঠিক এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল মৃদু সেতারের মতো। উঠলাম না। শিশিটা উপুড় করে দিলাম গলার মধ্যে।

হায়! ফাঁকা শিশি প্রেমহীন হৃদয়ের মতো চেয়ে রইল আমার শূন্য হৃদয়ের দিকে। এক ফোঁটা বিষও ঢালতে পারল না সে। অমৃতও না।

উঠে টেলিফোনটা যখন ধরছি তখন কেন যেন খুব ইচ্ছে করছিল, টেলিফোনে যেন জয়দেবের গলার স্বর শুনতে পাই।